চীন থেকে ফিরে

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

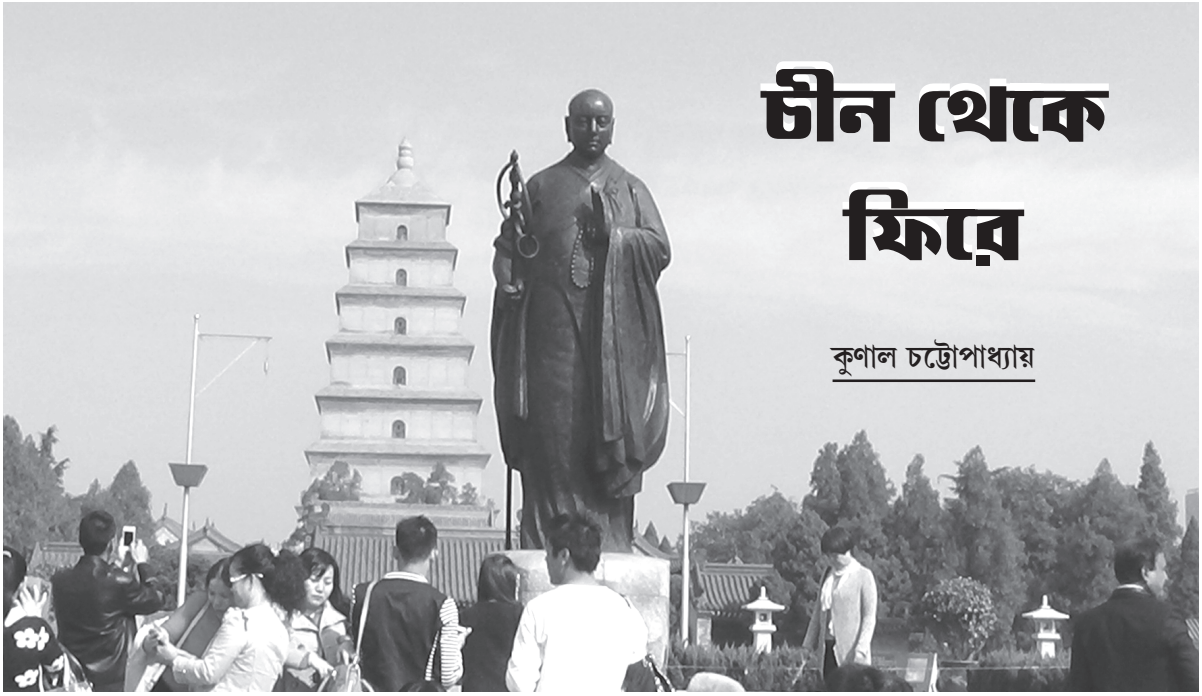

ওয়াইল্ড গুজ প্যাগোডা

মার্কিন কূটনীতিক ও অর্থনীতিবিদ কেনেথ গলব্রেথ ১৯৫৫ সালের শরতকালে হার্ভার্ড থেকে লম্বা ছুটি নিয়ে জেনেভা গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য 'গরিব কেন গরিব' এই শিরোনামে একটা বই লিখবেন। জেনেভায় অবস্থানকালে শহরের এক পুরনো এলাকায় অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ গলব্রেথকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানালে হার্ভার্ড-ডন বলেন তিনি ভারত সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাই আসতে চান না। উত্তরে অধ্যাপক মহলানবিশ বলেন এই জন্যই আপনার ভারতে আসা উচিত। সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেন আমরা আপনার সব খরচ ও আতিথ্য দেব। এদেশের যেখানে যেতে চান তার ব্যবস্থা করবো। আপনার কোনো Assignment থাকবে না। আমরা আপনাকে আমাদের দেশ দেখাতে চাই। আপনি যতদিন খুশি থাকতে পারেন। কেবল কথা দিতে হবে অন্তত তিন মাস এদেশে থাকবেন। কারণ এর চেয়ে কম সময়ে একজন এদেশ সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারবে না। গলব্রেথ ভারতে এসেছিলেন। দমদম বিমানবন্দর থেকে আসার পথে পথের দু'ধারে সদ্য দেশভাগজনিত শরণার্থীর প্লাবন দেখেছিলেন যার অন্যতম ফসল তাঁর বিখ্যাত The Affluent Society বইটি।

আমাদের চীন ভ্রমণের প্রেক্ষিত কোনো ভাবেই গলব্রেথের সাথে তুলনীয় নয়। রাষ্ট্রপতির আত্মীয় হয়ে কিংবা শিবির বদলানো সেলিব্রিটির মতো শুভেচ্ছা সফরে চীন যাত্রার প্রশ্নই আসে না। তাই হিসেবের কড়ির পূর্ণ ব্যবহারে মহাচীন দর্শনের অভিলাষে ভারতীয় রেলের চার বন্ধুর সঙ্গে রওনা দিলাম গত কোজাগরী রাতে। দলে দু'জন মহিলা। মাত্র বারো দিনে চীনকে চেনা বাতুলতা। তবুও দামি পুরনো আচারের মত চেখে চেখে রসাস্বাদনে ক্ষতি কী? হলোই বা না হয় অন্ধের হস্তীদর্শন।

বছর কয়েক হলো চায়না ইস্টার্ন কলকাতা-কুনমিং উড়ান চালু করেছে। বাণিজ্যিক ভাবে সফল উড়ান। হৈ হৈ করে যাতায়াত করছে দু'দেশের সওদাগরের দল। সেই সঙ্গে আমাদের মতো পর্যটক। ধূ ধূ প্রান্তরের মাঝে বিশাল ঝাঁ চকচকে বিমানবন্দর। প্রায় আধ কিলোমিটার টার্মিনালে শ'খানেকের কাছাকাছি বোর্ডিং গেট। কলকাতা-কুনমিং কার র‍্যালিতে অংশ নেওয়া অভিনেতা ভিক্টর ব্যানার্জিকে বলতে শুনেছি, 'চীনারা ছোট আকারে কিছু বানাতে অভ্যস্ত নয়।' অবশ্য যারা গ্রেট ওয়াল বানায় তারা ছোট কিছু বানাবেই বা কেন?

রাত সাড়ে বারোটার ফ্লাইট। দু'ঘন্টা পর যখন কুনমিং পৌঁছলাম স্থানীয় সময় ভোর সাড়ে চারটে। এয়ারপোর্টে লিলি নামের মেয়েটির লাসা যাওয়ার পারমিট নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করার কথা। তাকে খুঁজতে হলো না। সেই আমাদের আবিষ্কার করল। মেয়েটির ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট ইংরেজি থেকে জানলাম ভোর রাতে রওনা হওয়ার পর পথে দুর্বৃত্তরা ওর ব্যাগ কেড়ে নেয়, তাতেই ছিল সেই পারমিট সার্টিফিকেট। আমাদের কাছে ফ্যাক্স কপি থাকলেও কাজ হবে না। অস্থির

ভাবে লিলি নানা জনকে ফোন করে চলেছে তার ভাষায়। আমরা সকলেই স্তম্ভিত। শুরুতেই একি কাণ্ড! চীন ভ্রমণের ভবিষ্যৎ নিয়ে সবাই যখন সবিশেষ চিন্তিত এমন সময় হাজির হলো সিসিলি ঝাউ। ছোটখাটো হাসিখুশি মেয়েটি সেখানকার ইন বাউন্ড ট্যুর সেন্টারের ডেপুটি ডিরেক্টর। ঝাউ ইংরেজিটা বলে মন্দ না। চীনে ৬০ শতাংশ লোকের কোনো ধর্ম নেই ঝাউ তাদের একজন। জানালো চোর নাকি ব্যাগে টাকা পয়সা না পেয়ে পারমিট পেপারটি ডাস্টবিনে ফেলে পালায় এবং সেটা পুলিশ উদ্ধার করেছে। লিলি চলে গেল সেটা আনতে। ভাগ্যিস লাসার বিমান ঘণ্টা চারেক পরে ছাড়ার কথা। আমাদের সকলেরই যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। ঝাউ নিয়ে গেল ম্যাকডোনাল্ডের কাউন্টারে নিজের খরচে চিকেন বার্গার আর কফি খাওয়াতে। কুনমিং-য়ের চীন তখন নব আনন্দে জাগছে।

দিল্লি থেকে লে গামী বিমান যেমন বেশ কাছ থেকে সমুদ্র সদৃশ বরফ শৃঙ্গের উপর দিয়ে যায় লাসা যাত্রা তেমনটা না হলেও বিশ্বের উচ্চতম বেশ কিছু শৃঙ্গের স্বর্গীয় দৃশ্য ধরা দেয়। ঝকঝকে শরতের রোদে সকলেই যেন একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। দুঃখ একটাই কোনটা লোৎসে কোনটা মাকালু কোনটাইবা সর্বোচ্চ চোমোলোংমার, রাধানাথ, সাগর-মাথা শৃঙ্গ কিংবা এভারেস্ট সেটা বোঝা গেল না। চীনা সুন্দরীর পরিবেশিত লাঞ্চ হাতে এ দৃশ্যে চক্ষু সার্থক করা এ যাত্রায় বাড়তি পাওনা। মাঝে মাঝে ম্যান্ডারিন ভাষায় কিছু বলা হচ্ছে।

লাসা বিমানবন্দরে শ্বেতশুভ্র টিবেটান সিল্কের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করল গাইড দাওয়া। মূল লাসা শহর থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে বিমানবন্দর। ছয় আসনের নতুন চীনা এসি গাড়ি ছুটলো ছয় লেনের রাস্তা ধরে। বাইরের প্রকৃতিতে লাদাখের ছোঁয়া। পার্বত্য নিসর্গে মাঝে মাঝে পপলারের সমাবেশ। গাড়ি সাংপো অতিক্রম করে ঢুকে গেল পাহাড়ি টানেলে। এই নদীই ভারতে ঢুকে ব্রহ্মপুত্র হয়েছে। একই ভূপ্রকৃতি একই মানুষজন, কেবল লে ভারতে লাসা চিনে। দুটোই তিব্বত।

মাত্র কয়েক ঘণ্টায় কলকাতা থেকে ১৩ হাজার ফিটের লাসায় অবতরণ, যে পথ অতিক্রম করতে অতীশ দীপঙ্করের লেগেছিল এক বছরেরও বেশি সময়। একদিক দিয়ে ভাবলে সুকুমার রায়ের গেছোদাদার ভাষায় রানাঘাট হয়ে তিব্বতের মতোই লাসার দূরত্ব কাক ওড়া পথে মাত্র ৪০০ কিমি। দিনটা আবহাওয়ার সঙ্গে একাত্ম হতে পিকিং ইস্ট রোডের হোটেলে ছ'তলার ঘরেই কাটানো হলো।

লাসা তিব্বতি বৌদ্ধদের পবিত্রতম স্থান। আর পাঁচজনের মতো কেবল নিষিদ্ধনগরী সাংহাই আর গ্রেট ওয়াল দেখতে চীন যাওয়ার দলে আমরা নেই। তাই লাসা তথা তিব্বতকে বাদ দিয়ে চীন দর্শনের প্রশ্নই আসে না। সাতসকালেই প্রায় বিশ-পঁচিশ পদের রাজকীয় ব্রেকফাস্টের আয়োজন। ভাত, ফেনাভাত, একাধিক পদের নুডল, কোরিয়ান ক্যাবেজ, যবের ছাতু, বেকন, পেস্ট্রি, কেক, তিন রকমের ফ্রুট জুস, ইয়াকের দুধের মাখন, জ্যাম, কফি, চা, ডিমের একাধিক পদ কী নেই।

আমাদের দলের সকলেরই কমবেশি ট্রেকিং ও মাউন্টেনিয়ারিং-য়ের অভিজ্ঞতা আছে। টেন্ট পিচ করে ঘোরার লোকেরা স্টার হোটেলের ট্যুরিস্ট হয়েছি। তাই মাঝে মাঝেই মুজতবা আলির গল্পের পণ্ডিতমশায়ের বাধ্য হয়ে নতুন ফতুয়া পরার কথা মনে পড়ছে। ইংরেজি বর্জ্জিত প্রতিবেশী চীন দেশে গাইড ছাড়া এক পা-ও চলা কঠিন তাই আমাদের বাধ্য হয়ে আর্মচেয়ার ট্যুরিস্ট হওয়া।

ঘড়ি ধরে দাওয়া হাজির। প্রায় মাঝবয়েসি মানুষটি অতি সজ্জন। লাসায় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকলেও ২৮০ কিলোমিটার দূরে Shigatse (তিব্বতি উচ্চারণে শিকাচে) নামে তিব্বতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে সোখান গ্রামে বাড়ি। সেখানে স্ত্রী ও কিশোর পুত্র থাকে। ষাট হাজার জনসংখ্যা অধ্যুষিত শিকাচের সঙ্গে পাঞ্চেন লামার ইতিহাস জড়িত। আমাদের মুখে পাঞ্চেন লামার নাম শুনে দাওয়াকে বেশ খুশি খুশি লাগলো।

অনেক দিক দিয়েই দলাই লামার মতো পাঞ্চেন লামাও বর্ণময়। ১৯৪৯-এ চীনের তিব্বত অভিযানের পর চীন সরকার পাঞ্চেনকে এই শিকাচেতে তাদের মনোমতো ধর্মগুরু হিসেবে অভিষিক্ত করে। ১৯৬১ তে চীনা সৈন্য যখন সেখানকার তাশিলাংপো মঠে ধ্বংস যজ্ঞ চালায় তখন এই লামা তিব্বতে ধর্মাচরণের স্বাধীনতা চেয়ে চেয়ারম্যান মাওয়ের কোপানলে পড়েন। মাও সেটিকে বিষাক্ত তির মনে করে গোপন রাখে। পরে পাঞ্চেন লামা তিব্বতের স্বাধীনতা দাবি করলে চীন সরকার ধৈর্য হারায় ও পাঞ্চেন বন্দি হয়। পঞ্চাশ বছর বয়সে পাঞ্চেন লামার মৃত্যু নতুন এক বিতর্কের জন্ম দেয়। ধর্মশালা থেকে দলাইলামা ছয় বছরের এক বালককে প্রথানুযায়ী নির্বাচিত করলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৯৫-এ চীনপন্থী লামারা আর এক বালককে মনোনীত করে। দলাইলামার নির্বাচিত বালকটির খোঁজ আর পাওয়া যায়নি এবং চীন মনোনীত পাঞ্চেন লামাকেও খুব কমই দেখা যায়। এই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে দাওয়াকে প্রশ্ন করলে তাকে দৃশ্যতই অপ্রস্তুত লাগল। চীনের এক নামি পর্যটক সংস্থার কর্মী সে। তার নিরাপত্তার স্বার্থে

আমরাও 'ভ্রমণে রাজনীতি নাস্তি' এই মন্ত্র মেনে নিলাম। ইতিমধ্যে দাওয়া জানিয়েছে ওদের পক্ষে বিদেশ যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তিব্বতের বাইরে গিয়ে কাজ পাওয়াও কঠিন।

হোটেলের অনতিদূরে লাসার প্রাণকেন্দ্র বারকোর অঞ্চল। গায়ে গায়ে লাগা বাড়িঘর ছাড়িয়েই প্রশস্ত পাথর বিছানো পথ। এই সকালেও কাতারে কাতারে ধর্মপ্রাণ মানুষজন চলেছে লাসা তথা তিব্বতের প্রাচীনতম জোখাং মন্দিরে। শামিল হয়েছে বহু দণ্ডি কাটা পুণ্যার্থী। হাতে ও কনুইয়ে এক ধরনের প্যাড বেঁধে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়ে চলেছে তারা। মাইলের পর মাইল দূর থেকে এরা আসে। শারীরিক কষ্টের মধ্য দিয়ে প্রত্যাশার জন্য দেবতার কাছে এহেন নিবেদন দেশ কাল নির্বিশেষে এক। মন্দির চত্বরে এমন পুণ্যার্থীর সংখ্যা অনেক। সেই সঙ্গে লাইনে দণ্ডায়মান অসংখ্য মানুষ। একস্থানে বৃত্তাকারে একদল বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সমাবেশ। তাদের মুখমণ্ডলের বলিরেখা বলছে এরা লাসার ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সে ইতিহাস জানার হাজার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। ব্যবধান ভাষা।

জোখাং মন্দিরে প্রবেশের জন্য বিদেশিদের বিরাট অঙ্কের টিকিট কাটতে হয়। আমরা তো এখানে অবশ্যই বিদেশি। বুদ্ধের দেশ থেকে এলেও রোজগারের প্রশ্নে চীনারা আমাদের আমেরিকান ট্যুরিষ্টদের সাথে এক পাল্লায় মাপে। দাওয়া আমাদের পাঁচজনকে নিয়ে সহজেই ঢুকলো। দু'ধারে দণ্ডায়মান বিশাল দ্বারপালের মূর্তি। দেওয়ালে শত শত বছরের প্রাচীন বুদ্ধের জীবন নিয়ে আঁকা চিত্রের ছবি তুলতে গিয়ে দলছুট হতে হলো। উদ্বেগ মাত্রা ছাড়া হলে লাইনে দণ্ডায়মান জনৈক যাত্রী তার ভাষায় আমার অবস্থা বুঝে দেখিয়ে দিল কোন পথে দলের বাকিরা গেছে।

কোন সুদূর অতীতে ৬৪৭ খৃস্টাব্দে তিব্বতের সংস্তান গাংপো প্রতিষ্ঠিত এই চারতলা মন্দিরে তিব্বতের ধর্মীয় ইতিহাস যেন টাইম ক্যাপসুলের মতো রাখা আছে। ২৫০০০ বর্গমিটার এর ব্যাপ্তি। দোতলায় মূল কক্ষে বিশাল পঞ্চ ধাতুর তথাগত বুদ্ধের মূর্তি। তিব্বতি ভাষায় এই মূর্তির নাম জে ভোরিন পোচে। রাজমহিষী গুয়েনচেং এটি চীন থেকে এনেছিলেন। দাওয়াকে অনুসরণ করে পশ্চিমমুখো মন্দিরশীর্ষ থেকে ধরা দিল দূরের পোতালা প্রাসাদ, যাকে বিমানবন্দর থেকে আসার পথে আগেই চোখের দেখা দেখেছি। অনেক তলায় দেখা যাচ্ছে মানুষের অন্তহীন প্রবাহ।

তিব্বতের প্রথম ধর্মপ্রাণ সম্রাট হিসেবে সংস্তান (তিব্বতি ভাষায় স্রংসান) গাম্পোর কথা ভাবা হয়। কেবল ধর্মই নয় শক্তিশালী শাসক হিসেবেও তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সপ্তম শতাব্দীতে এই সম্রাট তিব্বতকে এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্রের রূপ দেন। গাম্পো ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে চীন আক্রমণ করেন। তাঙ্গ বংশীয় চীন সম্রাট তাইত সুঙ্গ সন্ধি করতে বাধ্য হোলে কন্যা ওয়েনচেঙ্গকে গাম্পোর সঙ্গে বিবাহ দেন। দু'বছর পর গাম্পো নেপালের রাজা অংশবর্মার কন্যা ভৃকুটীরও পাণিগ্রহণ করেন। এই দুই সতীন বৌদ্ধধর্মের আওতায় লালিত পালিত হওয়ায় গাম্পো বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। বানিয়ে দেন দুই রানির জন্য দুটি বৌদ্ধ মন্দির। একটি এই জোখাং ও অন্যটি অপেক্ষাকৃত ছোট রামোচে। গাম্পো দেশে কৃষি থেকে শিক্ষা সর্বক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। পশ্চিমে খোটান, কাশ্মীর, নেপাল, ভারত, চীনের মতো উন্নত দেশগুলি থেকে শিক্ষাসংস্কৃতির সুপবনে তিব্বতকে সমৃদ্ধ করেন। কাশ্মীরের সারদা লিপি ও মগধ এবং বাংলার নাগরী অক্ষরের বর্ণমালা থেকে তিব্বতে বুচন বর্ণমালার প্রর্বতনও তাঁর অবদান। সামগ্রিক মূল্যায়নে গাম্পোকে তাই তিব্বতের অশোক বলা হয়।

জোখাং থেকে ড্রিপেঙ মনাস্টারি যাওয়ার পথে দাওয়ার কাছে রক্ষিতা আর অতিশার উল্লেখ ঘন ঘন পাচ্ছিলাম। বাংলার শান্ত রক্ষিত আর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান আজও ধর্ম ও ইতিহাসমনস্ক তিব্বতিদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র। দুঃখের বিষয় এই দুই বাঙালি পণ্ডিতের স্মৃতি বিজড়িত শেরা ও নেথাং মনাস্টারি দেখা হলো না। নেথাং-এ ৭২ বছর বয়সে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আমাদের হিন্দু সাধকদের মধ্যে যেমন পুরী, গিরি, সৎনামি, অঘর প্রভৃতি মার্গের বা সম্প্রদায়ের সন্ধান মেলে তিব্বতি বৌদ্ধ ধর্ম তেমন চারটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এগুলো হলো ঙ্মা নিঙ্গমো, কাগিউ, শাক্য ও জেলুগ। তিব্বতি ভাষায় 'শাক্য' অর্থ অহল্যা জমি।

প্রখ্যাত স্কলার তিব্বতি বৌদ্ধ ধর্মগুরু সংখ্যাপার শিষ্যরা তাঁর জীবদ্দশায় তিনটি জেলুগ মঠ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন। এগুলি হলো গান্ডেন, শেরা ও ড্রেপাং। চীনা অধিগ্রহণের আগে প্রথম দুটিতে ৫০০০ করে সন্ন্যাসী বাস করত। ড্রেপাং-এ ছিল ৭০০০ জন। লাসা থেকে কিছু দূরে বেশ খানিকটা উপরে রুক্ষ, বৃক্ষহীন পাহাড়ে বর্তমানে এগুলি নতুনভাবে গড়ে তুলছে এখানকার ধর্মপ্রাণ মানুষজন। বলা যায় বাঁচিয়ে রাখছে কিছু লামা। এখানকার কিচেনের বিশালাকার পাত্র অতীতের স্মৃতি বহন করছে, যখন এই জনহীন পর্বতময় অঞ্চল Monastic city -র চেহারা নিয়েছিল। দলাই লামা

এই জেলুগ গোষ্ঠীর ধর্মগুরু। যদিও পরবর্তীকালে তিনি সমগ্র তিব্বতিদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের ইয়ারো আনভিসিটেডের মতো লাসাকে ঘিরে একটা লালিত ধারণা দলের সকলেরই ছিল। সেটা বিমানবন্দর থেকে আসার পথেই অনেকটা ফিকে হয়েছে। জোখাং দর্শনের পর কাশী-জেরুজালেমের মতো প্রাচীনত্বের প্রত্যাশী মন পোতালা প্রাসাদের পথে পদে পদে ধাক্কা খেল। বেজিং রোডের দু'ধারে বিশাল বিশাল আধুনিক সরকারি ভবন। জনশূন্য ছয় লেনের নির্ধারিত অংশে মানানসই সাইকেল রিক্সা। চায়না পোস্ট বিল্ডিং-এর পর ধীরে ধীরে এসে গেলাম বিশাল পোতালা স্কোয়ারে।

বিশ্বনাথের গলি, দশাশ্বমেধ ঘাটকে বাদ দিয়ে কাশী কিংবা ওয়েলিং ওয়াল, সোক্ আরাবিক ষ্ট্রীট ছাড়া জেরুজালেমকে লোম কামানো ভেড়ার মতো লাগতে বাধ্য। ১৩০০ বছরের পোতালায় এসে কেউ কেউ তেমনটা ভাবতেই পারেন। দক্ষিণের প্রাসাদ-ঘেঁষা বিশাল যে জলাশয়ে একদা সম্পূর্ণ প্রাসাদের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হত তা এখন অনেক দূরে। অর্ধেক জলাশয় ভরাট করে বানানো হয়েছে বিশাল বাঁধানো পোতালা স্কোয়ার। স্থানীয় পুরনো তিব্বতি বাড়িঘরের চিহ্ন নেই।

বিশ্বে প্রথম আকাশচুম্বী অট্টালিকা নির্মিত হওয়ার আগে ১৩ তলা উঁচু ৪০০ ফুটের এই পোতালাকে এই গ্রহের উচ্চতম সৌধ ভাবা হত। যে পাহাড়ের ওপর এই প্রাসাদ রাজকীয় মহিমায় দণ্ডায়মান তাকে তিব্বতিরা মাউন্ট মারপোরি বলে। ১৯৫৩ -তে এর সাদা অংশ সম্পূর্ণ হয়। লাল অংশটি ৫০ বছর পরে নির্মিত। এক হাজার কক্ষ বিশিষ্ট এই প্রাসাদের সর্বত্র যেন একটা স্পষ্ট শূন্যতা। এখান থেকেই চতুর্দশ দলাইলামা ভারত উদ্দেশে অগস্তযাত্রা করেন।

১৯৫০-এর ৭ অক্টোবর যখন চীনের কমিউনিস্ট লিবারেশন আর্মি তিব্বতে প্রবেশ করে তখনও এই পোতালার সামনে তিব্বতের চিন জয়ের একটা স্মারক ছিল। আজ সেই স্মারক দূরের কথা পোতালার বৌদ্ধ ধর্ম আজ পর্যটনের উপকরণ ভিন্ন কিছুই নয়। দলাই লামার ছবি পর্যন্ত রাখা সেখানে রাজনৈতিক অপরাধ বিশেষ। তবুও গাইড দাওয়া ব্যাখ্যা করে চলে কোন ঘরটায় দলাই লামা থাকতেন, কোনটা ছিল তাঁর স্টাডি। সমগ্র প্যালেসের মধ্যে ফটো তোলা নিষিদ্ধ।

নানা সূত্র থেকে জানা যায় তথাকথিত সংস্কৃতির বিপ্লবকাল পর্যন্ত চীন সরকার ৬০০০ বৌদ্ধ মনাস্টারি ধ্বংস করেছে। তার ৯৫ শতাংশই গ্রামে। চীন সরকারের কাছে সেটা ছিল তিব্বতের শান্তিপূর্ণ মুক্তি। লাসার তিব্বত মিউজিয়ামে সযত্নে রাখা আছে ২৩ মে, ১৯৫১-তে চুক্তি স্বাক্ষরের ছবি যার নিচে চিনা ভাষার সাথে ইংরেজিতে লেখা ঃ The agreement of the Central People's Government and the Local Government of Tibet on Measures for the Peaceful Liberation of Tibet.

বার্ট্রান্ড রাসেল রাশিয়ার বলশেভিজম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কমিউনিজমকে একটা ধর্ম হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন। সেই হিসেবে সোয়াত ভ্যালি ও মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্ম বিলীন করে ইসলামের বিস্তারের সঙ্গে তিব্বতের ইতিহাসকে কেউ কেউ মেলাতে পারেন। সেই সঙ্গে এটাও সত্য ২০০০ বছরের তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম ও মাত্র ৭৫ বছরের চিনা কমিউনিজমের লড়াইটা সহজ হয়নি। আর হয়নি বলেই আজকের চীন অন্তত তার বৌদ্ধ স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলোর পর্যটন মূল্যটুকু বুঝেছে। সেগুলোকে বামিয়ান বানায়নি।

'ওয়াক এ মাইল আফটার ডিনার' মেনে সদলবলে গাইড ছাড়া রাতের পোতালা দর্শনে গিয়ে মনে হল চীন যেন লাসাতে শাঁজে লিজে বা ফিফথ এভিনিউ বানাবার ব্রত নিয়েছে। ভারতীয় টাটা বা মারুতি ছাড়া প্রায় সব বিদেশি গাড়ির আলো, গোল্ডেন ইয়াক প্রভৃতি নাইট ক্লাব-শপিংমলের রোশনাই, বিশ্বায়নের ছোঁয়ায় ম্যাকডোনাল্ড, কে এফ সি, বুটিক বিপণি— লাসাকে আধুনিক বিশ্বের যে কোনো নগরীর সমতুল্য করে তুলেছে।

গাইডের ক্লান্তিহীন ইতিহাস ব্যাখ্যা ও তার গতির সাথে পাল্লা দেওয়া নেই। সকলের মধ্যেই একটা ফুরফুরে মুক্তির স্বাদ। ফলে যা হবার— পথ হারিয়ে ফুড স্ট্রিটে ঢুকে পড়া। দোকানিরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী। মাথায় স্কাল ক্যাপ। যথারীতি মহিলাকর্মী বেশি। আমাদের বিরামহীন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছে খুশি মনে। ইঙ্গিতে বা অঙ্গভঙ্গির সাহায্য নিয়ে হাসতে হাসতে বোঝাচ্ছে কোন মাংসটা হাঁসের, কোনটা বকের আর কোনটাই বা ইয়াকের।

মহাচীনের অর্থনীতিতে ২০০৮-এর অলিম্পিক যে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তা বিশ্বের উচ্চতম তিব্বত উপত্যকা রেলপথ বলে দেয়। ওই ক্রীড়ানুষ্ঠানকে পাখির চোখ করে মাত্র পাঁচ বছরে চীন প্রশাসন ২০০৬-এ চালু করে এই এঞ্জিনিয়ারিং মার্ভেলটিকে। কাছিম গতির ভারতীয় গণতন্ত্রে হয়তো ওই সময়ে আইনগত জটিলতায় জমি সমস্যাই মিটতো না। কুনলুন, টানগুলা প্রভৃতি পর্বতমালা ভেদ করে ৪৫ টা স্টেশন সমৃদ্ধ ১৯৫৬ কিলোমিটারের এই রেলপথের প্রায় অর্ধেকটাই ৪০০০ মিটার (১৩২০০ ফুট) ওপর দিয়ে গেছে।

জোখাং টেম্পল

এই পথের সর্বোচ্চ উচ্চতা হল ৫০৭২ মিটার (১৬৭৩৭ ফুট)। সমগ্র চীনের ভৌগোলিক আয়তনের ২০ শতাংশ জুড়ে যে তিব্বত (যার আধুনিক প্রশাসনিক নাম টিবেট অটোনমাস রিজিয়ন) যেখানে দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র এক শতাংশের বাস। সেখানে এহেন ময়দানবীয় কর্মকাণ্ডের অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা নিয়ে অর্থনীতিকরা ভাবতেই পারেন।

রেল কর্মচারীদের মধ্যে সামরিক ঢঙ-এর সুশৃঙ্খল পেশাদারিত্ব থেকে চলন্ত ট্রেনে সর্বক্ষণ ফুটন্ত জলের সরবরাহ নজরে পড়ার মতো। চার শয্যাবিশিষ্ট কামরায় মাথার কাছে ছোট টিভি। যদিও সেগুলো কাজ করেনি। টিকিটের ক্ষেত্রে সফট ও হার্ড দুটি ভাগ যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মতো। এয়ার ইন্ডিয়ার in flight reading 'স্বাগত'-এর মতো পত্রিকা China Railway Literature and Art সিটে রাখা। অবশ্য ম্যান্ডারিন ভাষায়। এছাড়া ম্যান্ডারিনেই People's Railway Daily রয়েছে। একদা বিশ্বে তৃতীয় ভারতীয় রেল আজও এমন ভাবনা থেকে কতো দূরে। একদিন আকাশবাণী কলকাতা 'বেতার জগৎ' প্রকাশ করত। এখন বন্ধ। আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না। রেলের ক্ষেত্রে আরম্ভটাই হয়নি।

বিশ্বের উচ্চতম রেলযাত্রা। দু'ধারে ধূ ধূ প্রান্তর। কখনো সমতল কখনো ঢেউ খেলানো। একটা স্টেশন চলে গেল নাম গু লু, তলায় লেখা উচ্চতা ৪৬৭৩ মিটার। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে বিচরণরত ইয়াকের দল। ছোট ছোট নদী ও জলাশয়। এক সময় বাইরের দৃশ্যপটে বরফে ঢাকা শৃঙ্গের সারি প্রায় অনুভূমিক উচ্চতায় আসায় বোঝা গেল কতোটা উচ্চতায় উঠে এসেছি। হঠাৎ এসে গেল বিশাল রাজকীয় নমোসো লেক (Namtso)। পুরো নাম নমোসো চুমকো। সমগ্র তিব্বতে এই হ্রদের নোনতা জল অতি পবিত্র মানা হয়। এ দৃশ্য দেখলে মনে হয় এত অর্থব্যয় এত পরিশ্রম সত্যি সার্থক। তুঁতে রঙের জল সাদা সাদা ঢেউ নিয়ে আছড়ে পড়ছে প্রায় রেলওয়ের ট্রাকে। যত দূর দৃষ্টি চলে জলের ব্যাপ্তি। কোথাও কোথাও জলের রঙ একাধিক। ধন্য চীনা রেল প্রযুক্তি। এপথে যাত্রা না করলে এদৃশ্য দেখার সুযোগ হত না। লে গেলেও সো মো রি রি, প্যাঙ্গং দেখা হয়নি। নমোসো যেন বলল, 'তাতে কী হয়েছে আমাকে দেখে যাও।'

নিয়ন্ত্রিত অক্সিজেন ও তাপমাত্রায় রাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটেনি। সকালে দেখলাম বাইরে দু'ধারে চরাচর বরফে ঢাকা। কোথাও একটা গোটা বাড়ি বরফের তলায়। তিব্বত বিশ্বের প্রায় অর্ধেক মানুষকে জল যুগিয়েছে। হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালে ভারতকে দিয়েছে ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধুর মতো নদ, উত্তরে চীনকে দিয়েছে অনেক নদ-নদীর মধ্যে হোয়াং হো, ইয়াং সি কিয়াং এমনকী ভিয়েতনামের মেকঙ-এরও জন্ম এখানে। সাইমন উইন্‌চেস্টার তাঁর বিখ্যাত বই The River at the Centre of the World -এ বলেছেন ভূগোলের বিচিত্র খেয়ালে

ইয়াং সি কিয়াং (স্বর্ণ বালুকার নদী) হিমালয়ের মতো হঠাৎ মুখ ঘুরিয়েছে। হাজার মাইল মেকং, ইরাবতী, সালুইনের পাশাপাশি দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে হঠাৎ পূর্বমুখো হয়ে সম্পূর্ণভাবে চীনের নিজস্ব নদীতে পরিণত হয়েছে। নদীর এই দিকবদলই বিশ্বকে দিয়েছে চৈনিক সভ্যতা।

একদা 'চীনের দুঃখ' হোয়াং হো (Yelow River) অতিক্রম করে কুইংঘাই প্রদেশের রাজধানী শহর শিনিং ও গানসু প্রদেশের রাজধানী লানঝাউ-য়ে ট্রেন থামলো। এই শহরগুলো জনসংখ্যায় উপচে পড়া, তবু বিশাল বিশাল স্টেশন ও সংলগ্ন এলাকাগুলোতে নগর জীবনের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। হতে পারে সাবেকি শহর থেকে অনেক অনেক দূর দিয়ে বানানো হয়েছে এই রেলপথ। চীনের ৯০ শতাংশ ভূভাগ বসবাসের যোগ্য নয়। যা কিছু বসবাস পূর্ব উপকূলে ও ইয়াংশি কিয়াং (বর্তমানে যার নাম চ্যাঙ জিয়াঙ) হোয়াংহো মধ্যবর্তী অঞ্চলে। তাই ১৩০ কোটির দেশে এহেন জনবিরল চেহারা অবাক করে। এ যেন পুরোনো চীন ভূখণ্ডেই নতুন চীন 'নিউ ওয়াইন ইন ওল্ড বটল।' চোখে পড়ছে কেবল ধূ ধূ প্রান্তর মাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে নব নির্মিত বহুতল। কোনোটাই ৩০ তলার কম নয়। গত কুড়ি বছর ধরে সমগ্র চীন জুড়েই চলেছে কনস্ট্রাকশন বুম। যেটা লক্ষণীয় তা হল প্রায় কোনো স্কাই স্ক্র্যাপারেই লোকজনের বসবাসের চিহ্ন নেই।

শিয়ান যখন এলাম অন্ধকার হয়ে গেছে। পাহাড়ি তিব্বত ছেড়ে সমতলের চীনে। স্টেশনের মূল গেটেই প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে ছোট্টখাট্ট হাসিখুশি চ্যাঙ। সে জানালো অন্যান্য গাইডের মতো তারও একটা পাশ্চাত্য নাম আছে ব্রিটনি। ব্রিটনি স্পীয়ারের ডাই হার্ট ফ্যান সে। স্টেশনের বাইরেই দীর্ঘ প্রাচীর আলো দিয়ে সাজানো। যেন আরব্যোপন্যাসের রূপকথার নগরী। চ্যাং বলল রোজ রাতে এমন আলো দিয়ে সাজানো হয় এই প্রাচীরকে। আক্ষরিক ভাবে বলা যায় Endless দেওয়ালী। তাং প্রাচীরের ওপর চতুর্দশ শতকের মিঙ সম্রাটদের গড়া এই প্রাচীরের কথা জানা ছিল, কিন্তু এই মহানগরীর সাথে পহেলা মোলাকাতেই যে তাকে এমন সালংকারা রূপে দেখবো ভাবিনি। এই প্রাচীর থেকে শহরের রূপ দেখা পর্যটকদের বড়ো পাওনা। আট ফুট চওড়া প্রাচীর পথে চলতে চলতে শিয়াং দেখতে চাইলে প্রায় সারা দিন লেগে যায়। ৬০টি গেট আছে ওঠার। পাশ দিয়েই বয়ে গেছে উই নদী। নদী সংলগ্ন পাড়কে কীভাবে সাজাতে হয় এদের কাছে শেখার। আজকের শিয়ান চীনের শাংশি প্রদেশের রাজধানী। সুনসান রাস্তা ধরে হোটেলের পথে গাড়ি ছুটলো। চ্যাং বলে এ শহরে ট্র্যাফিক জ্যাম হয় না। ৮৪ বর্গ কিলোমিটারের শিয়াং মহানগরীতে প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষের বাস। সেখানে ট্যাফিক জ্যাম নেই তাও কি সম্ভব? দমদমে নেমে নিউ টাউন দেখে বিদ্যাসাগর সেতু ধরে জুতসই সময়ে হাওড়া গেলে যে কেউ বলতেই পারে কলকাতার পথে যানজট হয় না। তবে এখানকার ছয় থেকে আট লেনের রাজপথ বিপ্লব দেখলে মনে হতেই পারে চীনে হয়তো সবই সম্ভব।

চীনের প্রাচীন রাজধানী এই শিয়ান। বিশ্বে ধারাবাহিক ভাবে টিকে থাকা শহরগুলির মধ্যে এটি একটি। লুওয়ান-শিয়ান অঞ্চলটিকে নানা দিক থেকেই চৈনিক সভ্যতার ধাত্রীগৃহ বলা চলে। ইউনেস্কো এই অঞ্চলটিকে এথেন্স, জেরুজালেম ও মক্কার সঙ্গে স্থান দিয়েছে। কবে কোন অতীতে গান্ধার, কাশ্মীর, খোটান, তুর্কীস্থানে সংস্কৃত যখন ছিল কথ্যভাষা তখন এই শিয়ান ছিল ব্যবসা, বাণিজ্য, ধর্ম, বিজ্ঞানের মোল্টিং পট। বেঙ্গল টু কনস্টানটিনোপল সিল্ক রুটে busy ant hill.

শিয়ানের ইতিহাসের সঙ্গে যে বৌদ্ধ পণ্ডিতটির নাম মিশে আছে তিনি হলেন মধ্য এশিয়ার করাসর কুচবাসী ভিক্ষু কুমারজীব (৩৪৪-৪১৩)। বর্তমানে এই কুচ চীনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাদীর্ণ শিরঃপীড়া উইঘুর সিংজিয়ান অঞ্চল। কুমারজীব ছিলেন কুচের এক উচ্চপদস্থ কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ আধিকারিকের সন্তান। অল্প বয়সে তিনি ভারতে এসে বেদ, গূঢ় জ্যোতিষ, জাদুবিদ্যা ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর বৌদ্ধধর্মের জ্ঞান সংক্রান্ত সুনামে আকৃষ্ট হয়ে তৎকালীন চীনা সম্রাট সৈন্য পাঠিয়ে তাঁকে ৪০১ খৃস্টাব্দে শিয়ানে নিয়ে আসেন। কুইন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ৩০০০ অনুবাদকারি সহ তিনি বিভিন্ন ভাষা চর্চা ও অনুবাদের এক আন্তর্জাতিক কেন্দ্র গড়ে তোলেন। এই দিক দিয়ে তাঁকে তুলনামূলক ভাষা চর্চার জনক আখ্যা দেওয়া যায়। প্রখ্যাত চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়েন ছিলেন কুমারজীবের শিষ্য।

কুমারজীবের ২০০ বছর পর শিয়ানে আসেন আর এক ক্ষণজন্মা বালপ্রৌঢ় গ্রন্থপ্রেমী কিশোর সন্ন্যাসী। বয়স তখন তাঁর মাত্র ১৩ বছর। নাম সুয়াং জাঙ। আমাদের কাছে তিনি হিউ-এন-সাঙ। তাঁর লুওয়ান থেকে সংস্কৃত শিখতে শিয়ানে আসা দেশাউ শহর থেকে ম্যাকসমুলারের বার্লিন আসার মতো।

হিউ এন সাং-য়ের সমসাময়িক অপর এক চীনা পরিব্রাজক আই-চিং ভারত ভ্রমণ শেষে আমাদের ইতিহাসের এক অত্যুজ্জ্বল অধ্যায়কে লিপিবদ্ধ করেন। ভারত দর্শনের প্রচেষ্টায় পথের ক্লান্তি নিঃশব্দে সহ্য করে এক সময় কতো সন্ন্যাসী বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে দেশে ফিরেছেন। অনেকে পথেই মৃত্যুকে বরণ করেছেন। এই সব সত্যসন্ধানীদের পরিপূর্ণ হিসেব কোথাও

নেই। যদিও আই-চিং-য়ের মতো পণ্ডিত পরিব্রাজক বেশ কিছু চীনা পর্যটকের কথা স্মরণে রেখে লেখনী ধরেছেন, উল্টো দিকে ভারত থেকে যাওয়া পণ্ডিতদের কথা কোনো ভারতীয়ই সে যুগে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনবোধ করেনি।

চীনা ঐতিহাসিকরা কিন্তু ষষ্ঠ শতকেই স্বদেশী পরিব্রাজক, সংগ্রাহক, অনুবাদকদের দুর্লভ জীবন কাহিনি সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছিল। সেই সময়ের অন্যতম সন্ন্যাসী হুই সিয়াও তাঁর বইয়ের মুখবন্ধে দু'ধরনের পরিব্রাজকের উল্লেখ করেছেন 'বিশিষ্ট' ও 'খ্যাতনামা'। কম প্রতিভার মানুষ যখন সমকালের স্রোতে গা ভাসিয়ে স্বীকৃতি ও সম্মান পান তখন তাঁরা খ্যাতনামা বা বিখ্যাত হন। অন্যদিকে যাঁরা প্রকৃতই 'বিশিষ্ট' তাঁরা সমকালের চাপ সহ্য করেও নিজের ধ্রুবকে নিঃশব্দে স্মরণ করেন। আই-চিং -য়ের দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল A Record of the Buddhist Religion as Practised in India AD 671-695 এবং Biographies of Eminent Monks who went to the Western World in search of the Law during the Great Tang Dynasty.

হোটেলের অদূরেই Wild Goose Pagoda. হিউ এন সাঙ-য়ের স্মৃতি বিজড়িত এই প্যাগোডাটি ৬৪৮ খৃস্টাব্দে বানানো হয় প্রধানত তাঁর ভারত থেকে আনা সংগ্রহকে সযত্নে রক্ষা করার জন্য। কয়েক হাজার গাড়ি রাখা যায় এমন বিশাল ভূগর্ভস্থ লনে গাড়ি রেখে পায়ে পায়ে এসে গেলাম অসামান্য প্যাগোডা চত্বরে। ৬২৯ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে তিনি ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে শিয়াঙে ফেরেন। সঙ্গে নিয়ে যান ৬৫৭টি সংস্কৃত গ্রন্থ, সাতটি বুদ্ধের মূর্তি, ১৫০টি স্মারক। হর্ষবর্ধনের উদ্যোগে কুড়িটি ঘোড়ার পিঠে ওই সব পাঠানো হয়। এই প্যাগোডা নির্মাণে প্রাতঃস্মরণীয় এই চীনা পণ্ডিত পরিব্রাজক কাঠ পাথর পর্যন্ত বহন করেছিলেন। প্যাগোডা নির্মিত হয় ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। যেখানে রাখা আছে ৬৪৬-এ তাঁর লেখা প্রথম প্রামাণিক ভারত আবিষ্কারের মহামূল্যবান গ্রন্থ যার ইংরেজি শিরোনাম Journal of West Countries in Tang Dynasty. অনুমান করা যেতেই পারে চীনের কম্পাস আবিষ্কারের আগেই তাঁর এই সফর। যাত্রাকালে তিনি বলেছিলেন, 'এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আমি পশ্চিমের পথে নেমেছি। ব্রাহ্মণ্যদেশ অবধি না পৌঁছে আর পূর্বদিকে যাব না। পথে যদি দুঃখ আসে আসুক, দুঃখ নেই।'

প্যাগোডার সামনে হিউ এন সাঙের এক অসাধারণ মূর্তি। চীনে এ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির মর্মর মূর্তি চোখে পড়েনি। হিউ এন সাঙ একমাত্র ব্যতিক্রম। অনেকটা মূর্তিহীন ঢাকায় বিশ্ব বিদ্যালয় চত্বরের বিবেকানন্দের মূর্তির মত। হিউ এন সাঙ ভারতের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য আহরণ করে সৃষ্টি করেছেন তাঁর অমূল্য বিবরণী ও সেই সঙ্গে আমাদেরও শিখিয়েছেন ইতিহাস সচেতন হতে।

ছবি তোলার সময় জনৈক চীনা ভদ্রলোক আমরা ভারত থেকে এসেছি শুনে লক্ষণীয় আগ্রহ দেখিয়ে বললেন Your India is great. Land of Buddha এক অনাস্বাদিত তৃপ্তি বোধ করলাম। সেই সঙ্গে যেটা বলতে পারলাম না সেটা হল, যে দেশ বিশ্বকে বুদ্ধ দিয়েছে সে দেশই পরবর্তী কালে নানা কুপ্রথায় বদ্ধ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে বুদ্ধ-র স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি রক্ষণাবেক্ষণে বছরে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ হয় সেটা বলিউডে একটা সাধারণ মানের ছবি নির্মাণ খরচের চেয়েও কম।

হিউ এন সাঙের মৃত্যুর পর লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর শেষকৃত্যে যোগ দিতে এসেছিল। সেদিন রাজা ছুটি ঘোষণা করেছিলেন। শহরের উপান্তে কুড়ি কিলোমিটার দূরে সেই পাহাড় শীর্ষে সিঙজিয়াও প্যাগোডা দর্শন সম্ভব হল না সময়াভাবে।

সপ্তম শতকের স্মৃতিতে ঋদ্ধ হয়ে আমরা চললাম আরও অতীতে খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে। চীনের পর্যটন মানচিত্রে সম্প্রতি এই 'আধুনিক প্রাচীন' আবিষ্কারটি হটস্পট হয়ে উঠেছে।

সে যুগের শাসকদের গুণের ঘাটের শেষ ছিল না। মিশরের ফ্যারাওরা পিরামিড বানালে গ্রেটওয়াল নির্মাতা কুইন শী হুয়ান বা কী কম যান? বানিয়ে গেলেন নিজের মৃত্যুর পর নিজের সমাধি রক্ষাকারী ৮০০০ প্রমাণ মাপের টেরাকোটা সেনার দল। তাদের পদ অনুসারে তাদের পোশাক, অশ্ব রথ এমনকী তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্র। স্থানীয় মাটি পুড়িয়ে বানানো এই সারি সারি সৈন্য যেন গুপী বাঘার গান শুনে স্থির হয়ে আছে। ১৯৭৬ সালে এই অঞ্চলে এক কুয়ো খুঁড়তে গিয়ে এদের সন্ধান মেলে। এখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে এখানকার নিচের স্তরে নাকি এমন আরও মূর্তির সন্ধান মিলেছে। ভগ্ন খণ্ডিত অংশ জুড়ে চলছে এদের নির্মাণকার্যও। দ্রষ্টব্যের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যেন স্তম্ভিত স্ট্যাচু হয়ে গেলাম।

পরদিন সকলের হাতে টিকিট ধরিয়ে বুলেট ট্রেনে বসিয়ে বিদায় নিল চ্যাং। জনহীন রুক্ষ ধূ ধূ প্রান্তরের মাঝে অনেক দূরে নব নির্মিত শিয়াং স্টেশন। নব নির্মিত রেলওয়ে ট্রাকও। স্টেশন থেকে দ্রষ্টব্য বলতে সারি সারি বহুতল অট্টালিকা। প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের গেটে সামরিক কায়দায় দণ্ডায়মান ইউনিফর্মড রেল কর্মচারী। বেশির ভাগই মহিলা।

ট্রেন ছেড়েই গতি নিল অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। মাত্র বছর

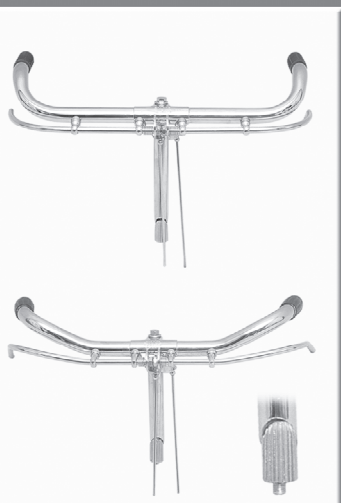

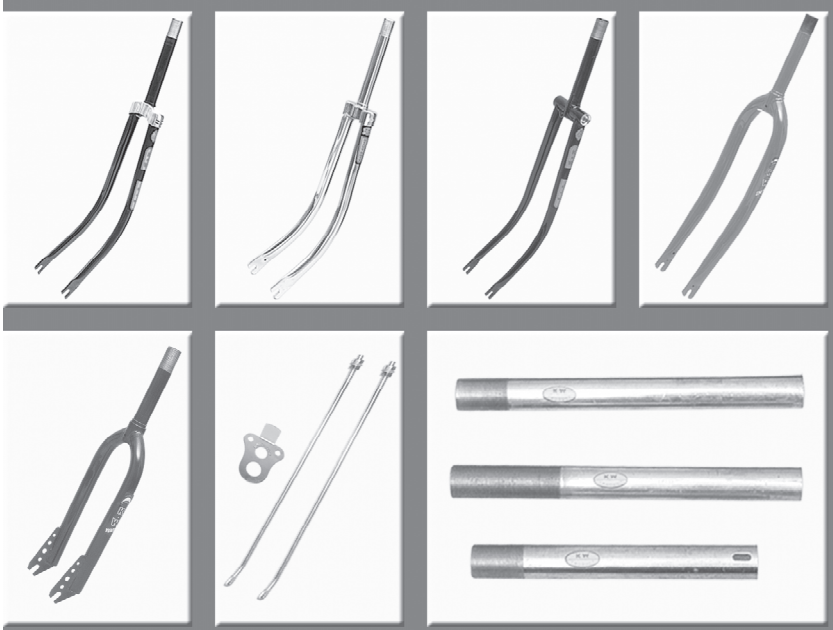

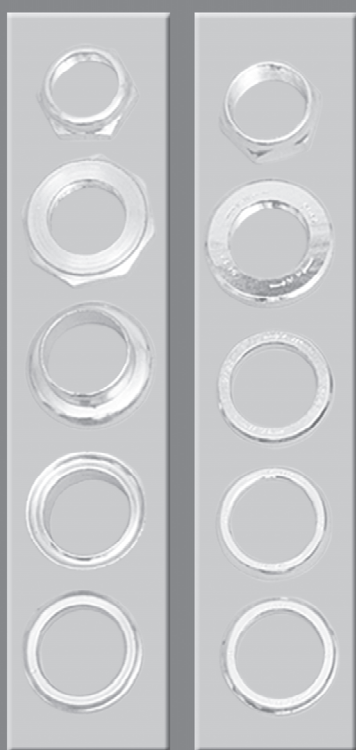

K.W
K.W. ENGG. WORKS (REGD.)
K.W
BICYCLE
K.W
BICYCLE
FORK
The Name of Quality
& Durability
K. W. Engineering Works (Regd.)
B-11, Focal Point, Ludhiana-141010 (Pb) INDIA
Phones : +91-161- 2670051-52-, 2676633
Fax : +91-161-2673250,
E-mail : sales@kwcycles.com,kwengg@sify.com
Website : http:/www.kwcycles.com

দু'য়েক হলো চালু হয়েছে চীনের আর এক চমক বুলেট ট্রেন। দু'পাশে বৈচিত্র্যহীন, বসতিহীন ভূপ্রকৃতি। সবুজের দেখা নেই বললেই চলে। গাছ বলতে সেই পপলার। মাঝে মাঝে বিশাল বিশাল কৃষিভূমি। এখানে এখন জমি তৈরির সময়, তাই জমিতে শস্য চোখে পড়ছে না। মাঝে মধ্যে বিশাল বিশাল হাইওয়ে। ট্রেনের গতি সর্বোচ্চ ৩০৫ কিলোমিটার ছুঁল। সর্বত্র নবনির্মিত পরিকাঠামোর চিহ্ন। চীনের কোথাও এ পর্যন্ত প্রাচীন, জীর্ণ, সংকীর্ণ, লোলচর্ম চেহারা দৃষ্টিতে এলো না। নিমেষে কেটে গেল ঘণ্টা দেড়েক সময়। এসে গেলাম হেনান প্রদেশের লুওয়ান। চীনের এথেন্স। এশহরে আমাদের গাইড মাঝবয়সি জ্যাক। সে জানিয়ে গেল পরদিন সকাল সকাল রওনা হতে হবে, কারণ সারাদিনে দ্রষ্টব্য অনেক।

জিয়াংসি জেলার ঝংঝাউ ওয়েষ্ট রোডে বিশাল পিওনি হোটেলের আটতলায় উঠে ভাবতে থাকি একদিনে দর্শন করতে হবে শ্বেতাশ্ব মন্দির (White Horse Temple), দেংফেং-এ সাওলিন মন্দির ও সর্বোপরি চীনের ইলোরা, লংমেন গুহা। শ্বেতাশ্ব মন্দিরটিকে চীন বিশ্বে প্রাচীনতম বৌদ্ধমন্দির ও সঙ্ঘারাম হিসেবে দাবি করে। এখানে এসে দর্শনার্থীর মনে প্রশ্ন জাগবে একে ঘিরে কোনো প্রাচীন লোকবসতির চিহ্ন মাত্র নেই কেন? তবে কি এটাও দীর্ঘকাল তক্ষশীলার মতো পরিত্যক্ত ছিল, নাকি নতুনভাবে এটির নবজন্ম ঘটেছে। গাইড জানালো মাওয়ের সংস্কৃতি বিপ্লবে এই অমূল্য ঐতিহাসিক সম্পদটিকেও কম ধকল সইতে হয়নি।

মূল মন্দিরে প্রবেশের অনেক আগে থেকেই নানা স্যুভেনির শপ। বিশালাকার ধূপের প্যাকেট, পোশাক, মালা প্রভৃতির মেলা। আর পাঁচটা পর্যটন কেন্দ্রের মতো। মন্দিরের বিশাল চত্বরে এদের প্রবেশ নিষেধ। ফলে রয়েছে এক সুপরিকল্পিত পরিচ্ছন্নতা। সুন্দরকে প্রয়োজনীয় ও প্রয়োজনীয়কে সুন্দর দুটোই করতে সারা পৃথিবী এমনকী আমাদের দেশের অন্যান্য তীর্থস্থানও মনোযোগী, কেবল আমরা বাঙালিরা বাদে। তাই খোদ লন্ডন হওয়ার প্রত্যাশী কলকাতায় কালীঘাটের মতো সুন্দর মন্দির চত্বরে এক দুঃস্বপ্নের পরিবেশ থাকে।

মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বারে লেখা মন্দিরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। হাং রাজত্বকালে এটি নির্মিত হয়। ৬৭ খৃস্টাব্দে সম্রাট হাং পিং ডি স্বপ্নে দেখেন স্বর্ণ বর্ণের এক সন্ন্যাসী পশ্চিম দিকে চলেছে। তা দেখে তিনি সৈন্যদের পাঠান সেই সন্ন্যাসীকে নিজের রাজ্যে আনতে। পরবর্তীকালে ৬৮ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষ থেকে প্রথম দু'জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী লুওয়ান-এ আসেন। এরা হলেন কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন। মহাচীনের সর্বত্র এই দুই ভারতীয়র অবদানকে সে দেশের বৌদ্ধিক বিকাশে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করা হয়। দুটি শ্বেত অশ্বের পিঠে বৌদ্ধ শাস্ত্র ও কিছু মূর্তি এনে এই মন্দির বানানো হয়। এগারো হেক্টর এলাকা জুড়ে ধাপে ধাপে সাতটি মন্দির নিয়ে উঠে গেছে দক্ষিণমুখী প্রাঙ্গণ। এখানে আছে ওই দুই মহান সন্ন্যাসী সহ বেশ কিছু ভারতীয় ও চৈনিক সন্ন্যাসীর মূর্তি। আছে God of Heaven, মহান বুদ্ধ, পিলু প্যাভেলিয়ন প্রভৃতি মন্দির। স্টেট ট্যুরিজম ব্যুরো ২০০০ সালে এটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের মর্যাদা দিয়েছে।

মূল মন্দির লাগোয়া অংশে সাম্প্রতিককালে জাপান, থাইল্যান্ড ও ভারত সরকারের উদ্যোগে নির্মিত বৌদ্ধ মন্দির। তুলনায় জাপানের মন্দিরটি প্রাচীন। ভারতেরটা সাঁচীর স্তূপের নিখুঁত রেপ্লিকা। ভিতরে অনিন্দ্য সুন্দর সারনাথের বুদ্ধ। ২০১০-এ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রতিভাদেবী সিং পাতিল এটি উদ্বোধন করেন।

অধ্যাপক লিয়াং শি চাও-য়ের লেখা থেকে জানা যায় ৬৭-৬৯ খৃস্টাব্দ থেকে পরবর্তী কয়েক শতকে অন্তত ৩৭ জন ভারতীয় পণ্ডিত চীনে পদধূলি দেন। এমনই একজন ভারতীয় পণ্ডিত বুদ্ধভদ্র ৪৬৪ খৃস্টাব্দে হেনান প্রদেশে শাওশি পর্বতের অরণ্যে পদার্পণ করেছিলেন। চীনা ভাষায় লিন শব্দের অর্থ অরণ্য। সাওলিনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক। এখানে এসেই প্রথম কনিফারে ঢাকা পাহাড় দেখা গেল। স্থানে স্থানে চিনার গাছ পোঁতা হয়েছে। কোনোটারই বয়স চার পাঁচ বছরের বেশি নয়।

ইতিহাসের কী বিস্ময়কর ধারা! ভারতীয় যোগ-তন্ত্র-সম্মোহন বিদ্যা ও সেই সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শন চীনের মাটিতে অঙ্কুরিত হল কুংফু তথা মার্শাল আর্ট হিসেবে। ভগবান বুদ্ধে নিবেদিত প্রাণ সেই সব অমিতবীর্যবান সন্ন্যাসী হিংস্র পশুর স্বর আয়ত্ত করে ও সেই সঙ্গে দস্যু তস্করদের মোকাবিলা করার জন্য যে যোগাভ্যাস চালু করেছিলেন কালে তা নয়টি মন্ত্রের কুংফু হিসেবে বিকশিত হল মহাচীনে। কুংফু যেন ভারতীয় যোগের চৈনিক সংস্করণ যা হিমালয়ের দক্ষিণের উষ্ণ সজল সুখী আবহাওয়ায় পূর্ণতা পায় না। দার্শনিক হিন্দু তার তাত্ত্বিক ভিত্তি গড়ে দিতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণ রূপ পাওয়ার জন্য প্রয়োজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের একাগ্রতা ও সেই সঙ্গে চীনা শরীর।

উদার প্রাকৃতিক পরিবেশে বুদ্ধ ভদ্রর স্মৃতি বিজড়িত শাওলিনে এসে বিস্ময়ে নির্বাক হতে হয় হাজার প্রাণের চোখ জুড়োনো সমাবেশ দেখে। গাইড জানালো এরা সংখ্যায়

৬০০০০, বয়স এদের ৬ থেকে ২২। ক্যারাটে, কুংফু, মার্শাল আর্টের নানান শাখার প্রতিনিধি হয়ে স্টেজ রিহার্শালে সমবেত হয়েছে। মুণ্ডিত মস্তক নানা রঙের ইউনিফর্ম ও হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে তারা নীরবে অপেক্ষমান শিক্ষকের নির্দেশের জন্য। মঞ্চ তৈরি হচ্ছে কোন এক আন্তর্জাতিক আসরের জন্য। মার্শাল আর্টের শহরে এহেন দুর্লভ আয়োজন যেন আমাদের কথা ভেবেই করা। মন্দির দেখে ঢুকে গেলাম অডিটোরিয়ামে Nine Scrolls Kungfu Revelations দেখতে। চীনের প্রথম যোগকেন্দ্রিক কুংফুর মঞ্চায়ন। যে নয়টি লক্ষ্য সামনে রেখে এই সাধনা সেগুলি হলঃ পবিত্রতা, সুভদ্র আচরণ, পরিশ্রম, শক্তি, শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা, প্রকৃত অবয়বের ধারণা, ভক্তি, মানসিক প্রশান্তি ও নিজেকে দৈনন্দিন ক্লীন্নতা থেকে দূরে রেখে স্বর্গলাভ। সমসাময়িক বিশ্বে অন্য প্রান্তে যখন অনাবিল বিশুদ্ধ প্রাণকে আতংকবাদে দীক্ষিত করার চেষ্টা চলছে তখন সাওলিং Sports কে ধর্মের মতো গ্রহণ করছে। এমনটি না হলে বিশ্বের খেলাধূলার আসরগুলোতে প্রথম স্থানে থাকা যায় না।

কুংফুর আবিশ্বাস্য নৈপুণ্য প্রদর্শন মাঝ পথে ছেড়ে উঠতে হল। এখনো লংমেন কেভ দর্শন বাকি। চীনের ইলোরা সেখানে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

বিশ্বে দর্শনের ইতিহাসে এমন দার্শনিক একজনই দেখা যায় যিনি দর্শন গড়তে গিয়ে একটি অভিনব ধর্ম প্রবর্তন করে বসলেন যা ভারতে জন্মলাভ করে সমগ্র এশিয়া মহাদেশকে প্লাবিত করেছিল। বুদ্ধকে নিয়ে গড়ে ওঠা ধর্মীয় আন্দোলনের একটা স্তরে তাঁর মূর্তি দেবতাজ্ঞানে পূজিত হতে লাগল। ইলোরার চৈত্যগুলি সে কথাই বলে। শিব ও বুদ্ধ সেখানে একাকার।

অনেকের মতে এশিয় শিল্প-উপবৃত্তের দুই নাভি ভারত ও মধ্য এশিয়ার প্রথম পরিচয় ঘটে চীন সম্রাট শী হোয়াঙ তি-র আমলে খৃঃ পূঃ ২২১ অব্দে। পরবর্তীকালে টিয়েনশান পর্বতমালার সানুদেশ ও তাকলামাকাল মরুভূমির সমন্তরালে বয়ে চলা তারিম নদী বরাবর রেশম তথা মশলা সড়কে কাশগড়, কুচ, তুরফান, মোগাও প্রভৃতি জনপদ ও মরূদ্যানে গড়ে উঠতে লাগল একের পর এক মরু-সঙ্ঘারাম। সেই সঙ্গে পড়ল অজন্তা শিল্পের স্বাক্ষর। আজকের চীনে এইসব কেন্দ্রগুলির সন্মুখে প্রত্নতাত্বিক সংস্থার ফলকে সেকথা সবিশেষ উল্লেখ করা আছে। বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গুহা চিত্র ও ভাস্কর্য ক্রমশ পশ্চিম থেকে পুবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পঞ্চম শতাব্দী থেকে ১৬শ শতাব্দী পর্যন্ত তা ছিল বিস্তৃত।

চীনা বৌদ্ধ শিল্পকলার সেরা নিদর্শন হিসাবে তিনটি স্থানকে চিহ্নিত করা হয়। এগুলি হল মোগাও, লঙমেন আর উনগাঙ। গানসু প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে ডানহুয়াং-এ ৩৬৬ খৃস্টাব্দে ৪৯২টি বুদ্ধমন্দির গড়ে উঠেছিল। ১০০০ বছর ধরে গড়ে ওঠা ওই চৈত্যগুলির মধ্যে মোগাও অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তাঙ যুগে রানি য়ু-র শাসনকালে লি জাংশিউ তাঁর চীনাভাষায় লেখা ফোকান জি বইয়ে (An Account of Buddhist Shrine) এই মোগাও এর কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তারও আগে, সা ঝাউ তু জিং (Geography of Shazhou) বইয়েও এই অঞ্চলের বর্ণনা মেলে। স্বল্পায়ু সুই রাজত্বে ও পরবর্তীকালে তাঙ আমলে এই ভাস্কর্য সংস্কৃতি বিকশিত হয় হাজার হাজার গুহায়। ইতিহাস সচেতন চীনাদের এই প্রয়াস নতুন করে আবিস্কার করে 'লাইব্রেরী কেভ'। এটি আবিষ্কৃত হয় ১৯০০ সালের ২৫ জুন জনৈক তাওবাদী চীনা ওয়াঙ উয়ানলুর হাতে। বালি সরিয়ে পাথরবন্দী অসংখ্য পাণ্ডুলিপি, ছবি প্রভৃতি উদ্ধার করা হয় লাইব্রেরি কেভ থেকে।

ওয়াঙ-য়ের আবিস্কার এর ঘটনা হাঙ্গেরিয় প্রত্নতাত্বিক অরেল স্টেইনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্টেইন সেই সময় এক ইন্দো ব্রিটিশ যৌথ প্রত্নতাত্বিক অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তিনি টাকার বিনিময়ে ওয়াঙের অনুমতি নিয়ে অজস্র পাণ্ডুলিপি, ছবি ও সিল্ক স্ক্রোল নিয়ে আসেন। পরবর্তীকালে ১৯০৮-এ ফরাসী পল পিলোঁ (Paul Pelloit) ১৯১১ তে জাপানি ওটানি কোজুই ও ১৯১৪ তে রুশ সের্গেই ওস্তেনবার্গও কয়েক হাজার নিদর্শন সংগ্রহ করেন। স্টেইন ও পিলোঁ পশ্চিমি বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করলেও চিনারা প্রথমদিকে তেমন আগ্রহ দেখায়নি। এইখানটিতে সেকালের ভারত ও চীন উদাসীনতায় সমগোত্রীয়। ভারতে লর্ড কার্জন দেখেছিলেন ভিক্ষুক ভবঘুরেদের তাজমহলে বসবাস করতে, খাজুরাহোর অমূল্য সৃষ্টি ভেঙে ভারতীয়দের তৈজসপত্রের কাজে লাগাতে।

মোগাও গুহার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট চীনা বিশেষজ্ঞ লুও ঝেনিউ বাকি পাণ্ডুলিপি নষ্ট না করার উদ্যোগ নিলেও সবটা তদানীন্তন পিকিঙে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। যেটুকু উদ্ধার করা গিয়েছিল তার কিছু চুরি হয়, বাকিটা রুশ বিপ্লবে দেশত্যাগী জারের সৈন্যদের হাতে নষ্ট হয়, যেমনটি হয়েছিল পর্তুগীজদের হাতে এলিফান্টা। পলাতক রুশ পল্টনরা ওই ডানহুয়াঙ গুহায় শিবির করেছিল। একালের ইতিহাসে চিনের অজন্তা রুশ পল্টনের হাতে ক্ষতবিক্ষত হলেও ভারতের অজন্তাকে কিন্তু অবগুণ্ঠন মুক্ত করেছিল বাঘ শিকারি একদল ইংরেজ পল্টন।

মোগাওয়ের ভাগ্য কিছুটা ফেরে ১৯৪১-এ যখন চীনা চিত্রকর ঝাঙ ডা কিয়াং আড়াই বছর ধরে ম্যুরাল চিত্রগুলোকে

সংস্কার করেন। একই সময় ঐতিহাসিক সিয়াং ডা কুওমিংটানের আমলে Research Institute of Dunhuang গঠন করে। অবশেষে নয়া চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-য়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯৬১ তে এটি প্রত্যাশিত মর্যাদা পায়।

নারায়ণ সান্যালের লেখা থেকে জানা যায় এখানকার বিশ্বান্তর জাতকের একটি কাহিনি-চিত্রের নীচে রোমান হরফে তিতা বা তিতাস নামের এক চিত্রকরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মোগাওয়ে মঞ্জুশ্রী ও বিমলাকীর্তি-র সাক্ষাৎ কিংবা বোধিসত্ত্বের জনৈকা নারীকে পবিত্র ভূমির (ভারতবর্ষ) পথে যাত্রার মতো চিত্রগুলোতে ভারত-চীন যেন একাকার হয়ে গিয়েছে। মোগাও গুহায় অবলোকিতেশ্বর ও ৫৭ জন সন্ন্যাসীর বোধিসত্ত্বের পূজার ম্যুরালটি অতীতে সোনার পাতে মোড়া ছিল। অজন্তার সঙ্গে ইলোরার যেমন কিউ-ইউ সম্পর্ক মোগাওকে বাদ দিয়ে লঙমেন তেমন অসম্পূর্ণ। তাই মোগাওকে নিয়ে পল্লবগ্রাহীতার কাজ না করে পারা গেল না। এ যাত্রায় মোগাও আমাদের কাছে অধরাই রয়ে গেল। আমরা কেবল চীনের ইলোরা লঙমেন দর্শন করলাম।

অজন্তায় যেমন গুহাগুলো অর্ধবৃত্তকার শির্না তটিনী বাগোড়ার তীর বরাবর খাড়া পাহাড়ের গায়ে নির্মিত লঙমেন তেমন নয়। এখানেও নদী আছে পুব পশ্চিমে প্রবাহিত। বাগোড়ার তুলনায় বেশ বড়ো এই নদীর নাম ই (Yi)। দুই তীরে সবুজে ঢাকা পাহাড়ের কোলে ১৪০০ ছোট বড় গুহায় এক লক্ষ লঙমেন বুদ্ধকে অসামান্য নৈসর্গে সাজিয়ে তুলেছে এই স্বচ্ছতোয়া-ই। নদীর এপাড় থেকে দেখা যায় চীনা শৈলীতে গড়া অসাধারণ সিয়াংশান মন্দির।

লঙমেনে কোনো কৈলাশ টেম্পল নেই। কেবলই বুদ্ধ। তাদের ক্ষুদ্রতমটির আকার এক ইঞ্চি ও বৃহত্তমটি ৫৭ ফুট। বেশির ভাগই ছোট ছোট কুলুঙ্গির মধ্যে। ড্রাগন গেটের মুখে অটলবিহারী বাজপেয়ীর লঙমেন ভ্রমণের আলোকচিত্র। কিছুটা উপরে শিয়ানের ফাহাই মন্দিরের সন্ন্যাসী হুইজিয়ানের নামাঙ্কিত গুহা। তাং যুগের এই গুহা ও স্থাপত্যটি মিনি ভাইরোকানা স্ট্যাচু বলে পরিচিত। তথাগতর সঙ্গী এখানে শিষ্য আনন্দ। অজন্তার মতো একটির পর একটি গুহা দর্শনে সমবেত হয়েছে হাজার হাজার পর্যটক। অধিকাংশই ডোমেস্টিক ট্যুরিস্ট। আমেরিকান ও ইয়োরোপিও পর্যটকও কম নয়। ভারতীয় কোনো ট্যুরিস্ট পেলাম না।

দেখতে দেখতে এসে গেলাম বিখ্যাত ফেং সিয়ান শী গুহায়। তাঙ যুগের সম্রাট লিঝির সময় (৬৭২ খৃঃ) এটি নির্মিত। রাজমহিষী উজেটিয়ান এটি নির্মাণে ২০০০০ চৈনিক স্বর্ণমুদ্রা দান করেছিলেন। সে সময় মূর্তিগুলি নানা রঙে রাঙানো ছিল। ৬৭৫ খৃস্টাব্দে এটি সম্পূর্ণ হয়। নদী সংলগ্ন পথ থেকে প্রায় ৫০টি সিঁড়ি ভেঙে বিশাল গুহামুখে সমাভিবাহারে উপবিষ্ট

সাংহাই বন্দর

ভাইরোকানা বুদ্ধ। প্রতিটি সিঁড়ি ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে ধরা দিল চীনের বৌদ্ধ স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনটি। মুখে এক অপার্থিব হাসি, সঙ্গে এক স্পষ্ট কৌতুকের ছোঁয়া। স্বীকার করতেই হবে এই সৃষ্টির বর্ণনা দেওয়ার কলম আমার নেই।

ঠিক এমনটাই ঘটেছিল অজন্তায় অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণি দর্শনকালে। সেটা ছিল গুহাচিত্র, এটি প্রস্তর মূর্তি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই সব সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে চোখ ক্লান্ত হয় না। অবলোকিতেশ্বরের উন্নত মস্তকে শিল্পী পরিয়েছিল রত্নখচিত রাজমুকুট, কণ্ঠে মুক্তর শতনরী, কর্ণে রত্নকুন্তল, বক্ষে কেবল উপবীত। তবু ছিল তাঁর আনত দৃষ্টিতে করুণাঘন আননে ত্যাগের মহিমা। ভাইরোকানা বুদ্ধের শিল্পী তাঁকে রত্নালঙ্কারে ভারাক্রান্ত করেনি। শাক্য সিংহ-র অঙ্গে এখানে পট্টবস্ত্র, বক্ষে দশছড়া হার। মস্তক, কর্ণ, কণ্ঠ ভূষণহীন। মহা ভিক্ষু যেন বিষয় বিষ বিকারের ঊর্দ্ধে এক মহাপ্রাণ হাসি ছড়িয়ে রেখেছে। এক অপার আনন্দময় পুরুষ যেন।

বলা হয়ে থাকে দেশে দেশে যত বুদ্ধমূর্তি গড়া হয়েছে তার মধ্যে গান্ধার মূর্তি সেরা। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সেই মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে একমত হয়েছিলাম সেই সিদ্ধান্তের সাথে। আবার সারনাথ বুদ্ধের কৈশোর লাবণ্যেও অভিভূত হয়েছিলাম। লঙমেনের এই দীপ্তিময় ভাইরোকানাকে দেখে মনে হল সুন্দরের কোনো কার্ডিনাল বা অর্ডিনাল মেজারমেন্ট হয় না। এই মূর্তিকে এদেশের লোক 'চাইনিজ মোনালিসা' বলে। এর মুখশ্রীর সাথে নাকি রানি জেটিয়ানের সাদৃশ্য ছিল। যুগে যুগে যেন ভাস্কর্যটি বলে চলেছে, 'কান্না যদি তিন চল্লিশ' 'হাসির সংখ্যা সাতান্ন।'

ভাইরোকানাকে সঙ্গ দিয়েছে এখানে অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী কাশ্যপ, অনুগত আনন্দ, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বোধিসত্ত্ব ও করুণাঘন স্বর্গের দেবতা। এছাড়া বীর্যবান দ্বারপাল ও সাহসী যোদ্ধা।

দর্শন শেষে বিদায়বেলায় পশ্চিমে চীনা সূর্য অস্তগামী। ই-র জলে তার রশ্মির ছটা। অন্য পাড়ের সন্ন্যাসীদের নামে নির্মিত গুহাগুলি, চিকিৎসার নিদান সম্বলিত প্রেসক্রিপশান কেভ ও সর্বোপরি সিয়াংশান মন্দিরে যাওয়া হল না।

লোইয়ং লংমেন স্টেশন থেকে বুলেটে চলেছি বেজিং। বারো কোচের ট্রেন। ব্রডগেজ হলেও আমাদের চেয়ে একটু ছোট মনে হল। আমাদেরই মতো চেয়ারকার। ঠিক পিছনের সিটে সান জিয়া নান মায়ের সঙ্গে চলেছে বেজিং। একে মহিলা তার ওপর চীনা। বয়স বোঝা কঠিন। মনে হয় ২৫-এর বেশি নয়। আমাদের বাংলায় কথা বলতে শুনে আলাপ করার প্রবল ইচ্ছে। সঙ্গী পার্থকে ট্রেনকর্মী চীনা ভাষায় ব্যাগ গেটের কাছে লাগেজ চেম্বারে রাখতে বলে গেল। তার কিছু পরেই মেয়েটি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজের মোবাইলটা আমার দিকে এগিয়ে দিল, তাতে লেখা Take care of your luggage, else you will be in trouble. অনেক কষ্টে শব্দ সন্ধান করে জানালো My english is very poor. চীনে দেখলাম অনেকেরই ধারণা ভারতে সকলেই ইংরেজি বলে। মাও-য়ের ছবি সম্বলিত ইউয়ান নোট উপহার দিল আমায়, আমি দিলাম গান্ধী ছাপের ভারতীয় নোট। কাগজে নিজের ফোন নাম্বার দিয়ে বলল মেয়েটি My english name is Lucky. স্টেশনে নেমে লাকি হাত নাড়িয়ে গেল। আমরা তখন গাইড ফোয়েবের সন্ধান করছি। ফোয়েবেরও ইংলিশ নেম লিও।

বিশাল মাল্টি স্টোরিড বেজিং নর্থ স্টেশন। লোকে লোকারণ্য। বিভিন্ন দিকে ওঠা নামা করছে যাত্রী বোঝাই এসকালেটার। আমাদের যেমন হাওড়া, শিয়ালদহ, কলকাতা বেজিঙে তেমন মূল স্টেশন চারটি। প্রতিটির আকার দানবীয়। এতদিন সুনশান স্টেশন থেকে কলকোলাহল মুখরিত বেজিংয়ে এসে বোঝা যাচ্ছে মহা চিনের মহারাজধানীতে পদার্পণ করলাম। দিল্লীর মতো Newest of New and oldest of old cities বলাই যায়। ভৌগোলিক ভাবে উত্তর চীন সমভূমির উত্তরে এই শহরের অবস্থান। আয়তনে গোটা বেলজিয়াম দেশের সমান। পাঁচ লক্ষ বছর আগে নব্য প্রস্তর যুগের পিকিংম্যানের সময় থেকে সমগ্র মানব সভ্যতার সাক্ষী এই নগরী নিজ গুণে স্থান করে নিয়েছে UNESCO-র হেরিটেজ তালিকায়।

বৃহত্তর বেজিংয়ের চাওয়াং জেলায় স্টার মুন হোটেল। এলাকাটা বৃহত্তর মুম্বাইয়ের থানের মতো। লিও জানিয়ে গেল বড় নোট সাবধানে ব্যবহার করতে বেজিংয়ে ফেক নোটের ব্যবহার প্রচুর।

সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে আমাদের প্রথম দ্রষ্টব্য তিয়েন আন মেন। বিশ্বের বৃহত্তম সিটি সেন্ট্রাল স্কোয়ার। ৪৪৪০০০ বর্গমিটার জুড়ে পাথর বাঁধানো পরিচ্ছন্ন চত্বর। এই সাত সকালেও হাজার হাজার মানুষের ঢল নেমেছে। তিয়েন (স্বর্গ) আন (শান্তি) মেন (দ্বার) অর্থাৎ স্বর্গীয় শান্তির দ্বার (Gate of Heavenly Peace)। দশ লক্ষ মানুষ এখানে সমবেত হতে পারে বলে দাবি করা হয়। বেজিং মহানগরীর কেন্দ্রে এখানকার অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার ছেদ বিন্দুতে এর অবস্থান। ১৪১৭ খৃস্টাব্দে সম্রাট ইঅঙ্গলের হাতে এর পত্তন হয়। স্কোয়ারের উত্তরে বিশাল তোরণ দ্বারের উপরে চেয়ারম্যান মাওয়ের পরিচিত ছবি। বৌদ্ধ প্যাগোডার অনুকরণে বিশাল বক্তৃতা মঞ্চ

সমেত এই দ্বার প্রায় আধ মাইল লম্বা আর দশ তলার সমান উঁচু। এই দ্বার দিয়েই 'নিষিদ্ধ নগরীতে' প্রবেশ করতে হয়।

মিঙ ও কুইঙ রাজাদের সময় এই তিয়েন আন মেন-য়ে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। ১৯১১-র বিপ্লবের পর এটি অবারিত হয়। ১৯৪৯ এর পর এটির আয়তন বেড়ে আজকের আকার নিয়েছে।

স্কোয়ারে প্রবেশ পথে বাঁদিকে বিশাল গ্রেট হল। তার পাশেই মাওয়ের সমাধি। যেখানে নবচীনের রূপকারের নশ্বরদেহ শায়িত। মাও পরবর্তী চীনে মাও নানাভাবে অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হলেও কারেন্সি নোট আর এই সমাধিতে তিনি বিরাজিত। চিরনিদ্রায় শায়িত নেতাকে দর্শনে বিরাট লাইন পড়েছে। গ্রেট হলের সামনে Monument of the People's Heroes নামের স্মারকের মনুমেন্টের সামনেই সমবেত হয়েছিল ১৯৮৯-এ হাজার হাজার গণতন্ত্রকামী ছাত্র-ছাত্রী। ১৯৮৯-র সেই মর্মান্তিক ছাত্রমেধ যজ্ঞের স্থানটির সামনে দাঁড়িয়ে মাথার টুপি খুললাম। ইউ টিউবের ছবির সাথে মেলাতে চেষ্টা করলাম অকুস্থলকে। বালজাকের কথাটা বোধ হয় মিথ্যে নয় 'Behind every success there is a crime.' এপর্যন্ত আধুনিক চোখ ধাঁধানো হাইটেক চীনের যেটুকু দেখলাম তার চোদ্দ আনাই ১৯৮৯ পরবর্তী সাফল্য।

লিও জানালো দু'ঘণ্টা লাগবে মাও দর্শনে। তারপর যেটা বলল সেটা অবাক করার মতো, মাও-এর আসল দেহ নাকি ১৯৮৯-এর পর সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সত্যি, নাকি নিজের কাজ কমানোর জন্য কে জানে। সমগ্র চত্বর জুড়ে স্থানে স্থানে পুষ্পশয্যা দেখার মতো। অনেক ক্ষেত্রেই এখানে নকল ফুলের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। তবু কেন যেন মনে হল এই সুবিশাল স্কোয়্যার সবুজ ঘাসে ঢাকা হলে আরো সুন্দর হোত। বেজিঙে সবুজের বড়োই অভাব। আমাদের ইন্ডিয়া গেট থেকে রাইসেনা হিল, বোট ক্লাব, পার্লামেন্ট এসব জুড়ে যে গ্রেট এরিয়া সেটা অনেক বেশি সবুজ।

এইসব ভাবতে ভাবতেই এসে গেলাম ফরবিডন সিটির অভ্যন্তরে। ১৪০৪-এ মিঙ রাজাদের (১৩৬৮-১৬৪৪) হাতে এর গোড়াপত্তন। পরবর্তীকালে কুইঙ রাজত্বেও এখান থেকেই প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হত। একে একে Hall of Preserving Harmony, Hall of Middle Harmony দেখে পৌঁছলাম Hall of Supreme Harmony -তে। রাজার আসন দর্শনে বিশৃঙ্খল ঠাসাঠাসি ভিড়। গাইড জানালো এই সুযোগে দুর্বৃত্তরা অনেককেই সর্বস্বান্ত করে। মনে মনে ভাবি হুজুগ, আবেগ এসবের প্রশ্নে দেশে দেশে কোন তফাত নেই। বিশ্বাস, ভক্তি, ভালোবাসা সর্বত্রই যুক্তি নিরপেক্ষ।

সত্যি বলতে কী ফরবিডন সিটি সম্পর্কে প্রত্যাশা ছিল আরও কিছুটা বেশি। আগ্রা ফোর্ট, উদয়পুর, মহীশূর, জয়পুর দেখা চোখে এই দ্রষ্টব্যটি তেমন বাড়তি মাত্রা যোগ করল না। তুলনায় সামার প্যালেস বেশি আকর্ষণীয় লাগে। বিশেষ করে বিশাল কৃত্রিম লেকের অনুষঙ্গ এই গ্রিন প্রয়াসটিকে বাড়তি সৌন্দর্য দান করেছে।

প্যালেসে ঢোকার মুখেই ছেঁকে ধরল সৌখিন লেডিস ব্যাগ নিয়ে মহিলা বিক্রেতার দল। হাজার লোকের ভিড়। গাইড লিও-র এগিয়ে যাওয়া এর মধ্যেই যদি শপিং সারা যায়। একশো ইউয়ানের ব্যাগ দশ ইউয়ানে রাজি হল। কড়কড়ে নোট নিয়ে প্রস্তুত একশো ইউয়ান ভাঙিয়ে দেওয়ার জন্য। নোট নিয়ে বলল ছেঁড়া নোট যদি পাল্টে দেন (অবশ্যই চীনা ভাষায়) পাল্টে দিলাম। মহিলা সঙ্গী দু'জন কিনতে চাইলে বিন্দুমাত্র আগ্রহ না দেখিয়ে নিমেষে হারিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে বিক্রেতা মহিলাটি। কিছু পরে আবিষ্কার করলাম নোটগুলো আদৌ চীনের নয়। বেলারুশের যার দাম অনেক অনেক কম। এমনকী ছেঁড়া বলে যে ১০০ ইউয়ানের নোট দিল সেটাও তাইওয়ানের।

নিজেকে ইশপের গল্পের নির্বোধ কচ্ছপ ভেবে মনে হল লাকি ও লিও দুজনেই গল্পের দুই উপকারী বকের মত আমাকে উদ্ধার করতে চেয়েছিল। আমি তাদের কথা না মেনে গুণাগার দিলাম। নিজের দেশে মুম্বাইয়ের জুহু বিচে ও দিল্লিতে লোটাস টেম্পল দেখতে গিয়ে পার্স খুইয়েছি। কলকাতায় বাসে খুইয়েছি দামি মোবাইল, পুণাতে গোটা সাইড ব্যাগ। বেজিং-ই বা বাদ যাবে কেন? এই সব light fingered gentry -র মুখোমুখি হলে নিজেকে হস্তীমুর্খ ভেবে হাত সাফাইকারী-কারিণীদের সাবাশ জানাতেই হয়।

লিও জানালো এখানে এটা নিত্য ঘটনা। সঙ্গী পার্থ পুলিশের সাহায্যের কথা বললে লিও বললো পুলিশ কিছু করে না। করলে করে উজুর। এরা পার্টি নিয়ন্ত্রিত শান্তিরক্ষী বাহিনী। এদের ইউনিফর্ম ছাই রঙের। একই সঙ্গে ভাবলাম এই চীন দেশেই কুনমিঙের পুলিশ আবার আমাদের লাসার পারমিট উদ্ধার করেছে।

লিও ছেলেটি অত্যন্ত স্মার্ট, বলা ভালো চৌখশ। লাসা বা লুওয়ানের মাঝবয়সি গাইডদের মতো শান্ত পরিণত নয়। বয়সের জন্য দোষও দেওয়া যায় না। ছয় রিঙের বেজিং-এ প্রান্তসীমায় এক বহুতলের বেসমেন্টে চার ঘরের চার পরিবার। এমনই একটি ঘরে মাকে নিয়ে আছে। সকলের জন্য একটাই টয়লেট। ভাড়া দেয় মাসে ১০০০ ইউয়ান। এখনো বিয়ে

করেনি। গাইড হিসেবে মাসে ৫০০০ ইউয়ান রোজগার হয়। সদাহাস্যময় ছেলেটি জানালো ৫০০০ ইউয়ানের কমে বেজিঙের শহরতলিতে বাঁচা সম্ভব নয়, ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৬০,০০০ টাকা। মায়ের বানিয়ে দেওয়া ফ্লাক্স ভর্তি চা সঙ্গে নিয়ে সে ঘোরে আর জলের মতো তৃষ্ণা পেলেই খায়। সামার প্যালেসের লেকের ধারে দাঁড়িয়ে লিও যখন কুইন, তাঙ, মিঙ ইতিহাস বলছিল তখন তাকে বলেছিলাম ইতিহাসটা পড়ে নেওয়া যাবে, তুমি বলো বেজিঙের কলুটোলা, খিদিরপুর, রাজাবাজার ও সেখানকার মানুষজন কোথায়? সঙ্গী বন্ধু আমার কথার মানে বুঝিয়ে দিলে লিও জানালো তারা থার্ড ফোর্থ রিঙের মাঝে আছে। আমাদের যেটা বস্তি এখানে সেটা হুতঙ। তাঙজিয়ালিঙ হুতঙের মতো পুরোনো ঘিঞ্জি অঞ্চলগুলোতে উপচে পড়া নিকাশি জল, ফুটজোড়া অস্বাস্থ্যকর খাবার দোকান, ঘরের মধ্যেই পোষা পায়রা, কুকুর, দশটি পরিবারের জন্য একটি টয়লেট সব আছে। এমনকী স্টিফেন হাউসের মত বিদ্যুতের হাজার তারের বিপজ্জনক সহাবস্থানও।

লিও এটাও জানালো এ শহরে এমন স্থায়ী বস্তিবাসীর সংখ্যা লক্ষাধিক। এদের পরিচিতি পত্র আছে ও সেই সঙ্গে এরা পায় কিছু কল্যাণকর ব্যবস্থার সুযোগ, যদিও সেটা খুবই সামান্য। সমস্যাটা বেশি ৭০ লক্ষ বহিরাগত শ্রমিক তথা মানুষজনের, যারা তাদের স্থায়ী এলাকার পরিচিতিপত্রের মাধ্যমে এই সুযোগ পায় না।

লাগোস থেকে লিমা কিংবা কায়রো থেকে কলকাতা সমগ্র দুনিয়া জুড়ে আকাশচুম্বী অট্টালিকার সঙ্গে বস্তির যে সহাবস্থান দেখা যায় বেজিং তার ব্যতিক্রম। আন্তঃরাজ্য অভিবাসনের রাশ একটু আলগা করতেই অন্ধের মতো দু'পয়সা রোজগারের সন্ধানে শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে ছুটে আসছে আজ লক্ষ লক্ষ চীনা নরনারী। তাদের বেশিরভাগই চলেছে উপকূলবর্তী শহরগুলোর দিকে। ভরিয়ে দিচ্ছে রেল স্টেশনগুলো। কেবল সিচুয়ান, হেনান, গানসু প্রদেশ থেকে তিন কোটির বেশি লোক ঘর ছেড়েছে পার্লকের গল্পের মত।

উপকূলবর্তী শিল্পকেন্দ্রগুলোতে বিদেশী পুঁজি টানার উদ্দেশে যে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল চীনে গড়া হয়েছে সেখানে বাধ্যতামূলক ওভারটাইম, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার হরণ এমনকী Hire and Fire নীতিকেও মেনে নেওয়া হয়েছে। তাই বিদেশী পুঁজি নিয়োগের ক্ষেত্রে আজকের চীনের সাফল্য নজর কাড়ার মতো।

চীনের আর্থিক বিকাশের এই প্রাথমিক সাফল্যকে অনেক বিশেষজ্ঞ অন্যভাবে দেখছেন। সংস্কার কর্মসূচির গোড়ায় গ্রামীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পার্টির প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ তুলে নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করলেও বিরোধী দল ও ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্বহীন চীনে চার কোটি শ্রমিককে রাষ্ট্রয়ত্ত ক্ষেত্র থেকে কর্মচ্যুত করতে সরকারকে তেমন বেগ পেতে হয়নি। সেখানকার কোন সিটু বা আই এন টি ইউ সি 'চীন বন্ধ' বা শিল্প ধর্মঘট ডাকার সুযোগ সেদেশে পায় না।

লন্ডনে যেটা টিউব প্যারিতে সেটা মেট্রো, কলকাতায় পাতালরেল, বেজিং-এ সাবওয়ে। সর্বমোট ১৮টা লাইন নিয়ে গড়া বেজিং সাবওয়ের স্টেশন সংখ্যা ২২৫টির মত। স্টেশনে ঢুকেই যেটা প্রথম চোখে পড়ল তা হল সিলিং থেকে প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত ফাইবারের আড়াল। ট্রেন এলে প্ল্যাটফর্মের গেটের সাথে ট্রেনের গেট মিশলে গেট খুলবে। অর্থাৎ কারোর পক্ষেই ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় লক্ষণীয় বস্তুটি হল স্টেশনে আমাদের কলকাতার মত তারস্বরে টিভি চালিয়ে শব্দ দূষণের ব্যবস্থা নেই। তৃতীয় বলার বিষয়টি হল স্টেশন থেকে শুরু করে ট্রেনের ভিতরেও ছবি তোলায় নিষেধাজ্ঞা না থাকা। এছাড়া ভিড়ের প্রশ্নে বেজিং কলকাতা এক।

স্টেশন থেকে বেরিয়েই বার্ডস নেস্ট স্টেডিয়াম। ২০০৮ এর অলিম্পিকের পর এই আধুনিক স্থাপত্যটি আজকের বেজিং এর অন্যতম আইকনিক সিম্বল। পাশেই বিখ্যাত সাততারা ড্রাগনরূপী হোটেল। সবই ঠিকঠিক জায়গায় আছে নেই কেবল দৃষ্টিগ্রাহ্যতা। এক অস্বাভাবিক ধোঁয়াশায় চতুর্দিক ঢাকা। লিও জানালো এটাই বেজিং-এর স্থায়ী আবহাওয়া। রাজধানী শহরকে ঘিরে একাধিক শিল্পাঞ্চলের মাত্রা ছাড়া ধোঁয়া উদ্গীরণের ফল এটা। খবরের কাগজে দেখলাম আগের দিন এই শহরে অনুষ্ঠিত ম্যারাথনে তিয়েন আন মেন থেকে বার্ডস নেস্ট ন্যাশানাল স্টেডিয়ামে যে ৩০,০০০ অংশগ্রহণকারীর যোগ দেওয়ার কথা তার ৩০ শতাংশই অংশ নেয় নি এই Smog বা ধোঁয়াশার জন্য। বহু অংশগ্রহণকারিকেই নাকে রুমাল বেঁধে ছুটতে দেখা গেছে। একই সময় বেজিং-এ অনুষ্ঠিত এশিয়া প্যাসিফিক ইকনমিক কোঅপারেশন (APEC) সম্মেলন চলাকালীন এই অঞ্চলে দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প ইউনিটগুলো বন্ধ রাখা হয়। ফলে বেজিং এর আকাশ কিছুটা উজ্জ্বল হলে বেজিঙাইটরা ঠাট্টা করে তাকে APEC Blue আখ্যা দেয়।

বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার পথে চীনের ড্রাগনিয়ান দৌড়ের অন্যতম ফল এই দূষণ। চীন এই মুহূর্তে বিশ্বে বৃহত্তম কার্বন সৃষ্টিকারী দেশ। গত বছর বিশ্বের মোট গ্রিনহাউস গ্যাসের ২৮ শতাংশ সৃষ্টি করেছে এই দেশ। মাথা পিছু কার্বন উৎপাদন ভারতে যেখানে ১.৭ টন, চীনে তা ৬.২

টন। চীনে শতকরা ৯৯টি পরিবারের বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। ভারতে এই সংখ্যাটা ৭৫। আমাদের প্রায় দশগুণ সিমেন্ট উৎপাদন করে চীন। ইস্পাতের ক্ষেত্রেও প্রায় একই কথা খাটে। ট্রেনে আসার পথে মিনি ও বৃহদাকার স্টিল প্ল্যান্ট নজরে এসেছে কম না। তার অলিম্পিক প্রস্তুতির অধীরতায় পারাদ্বীপ বন্দর থেকে ভালো পরিমাণ স্টিল রপ্তানি করেছিল ভারত।

চির ক্ষুধার্ত দৈত্যের মতো থেমে নেই চীন। শি জিনপিং ঘোষণা করেছেন ২০৩০ সালে চীন কার্বন উদগীরণের শীর্ষে পৌঁছবে এবং পরবর্তী ১৬ বছরে ৮০০ গিগাওয়াট শক্তি উৎপাদন করবে কেবল পুনর্নবীকরণ উৎস থেকে। চীনা ড্রাগনের এই লক্ষ্য পূরণের জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক হিসেব করে দেখেছে চীনকে প্রতি সপ্তায় চারটি করে বায়ুচালিত টারবাইন ও প্রতি তিন সপ্তায় একটা করে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টার নির্মাণ করতে হবে। চীনের কম্যান্ড ইকনমি আর লক্ষ্যপূরণের সাফল্য থেকে তা অসম্ভব নাও মনে হতে পারে। সেক্ষেত্রে ২০১২ সালেই শিল্প দূষণের কারণে সাত লক্ষ লোকের অসময়ে মৃত্যুর ঘটনাটাকে ১৯৮৯-এ 'স্বর্গীয় শান্তির দ্বারে' ৩০০০ ছাত্র হত্যার মতো চীনকে উপেক্ষা করতেই হবে।

টি হাউস যাওয়ার পথে চলন্ত গাড়ি থেকে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দেখে মনে হল যদি কোনো কফি কর্নারে ঘণ্টাখানেক আড্ডা দেওয়া যেত জানতে চাইতাম এরা বলিউডি মুভি দেখে কিনা কিংবা চীনের এ.আর.রহমানই বা কে? অরুণাচল নিয়ে রাষ্ট্রনেতাদের মতো ওরাও কি মাথা ঘামায়? লাসা মিউজিয়ামে বা শিয়াঙে কয়েকজন চীনা ছাত্র আগ্রহ দেখালেও ভাষাগত প্রতিবন্ধকতায় তা ছিল ক্ষণস্থায়ী। বিশাল চীনের ৮০ শতাংশ লোকের ভাষা ম্যান্ডারিন। আমরা তার বিন্দুবিসর্গ বুঝি না। আবার চীনাদের পক্ষেও ভারতের বিচিত্র ভাষা অরণ্য ভেদ করা কঠিন। ইংরেজি গুডমনিং বা থ্যাঙ্কস বললেও ওরা ভাবলেশহীন থাকে।

এখানকার সারস্বত জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়া হল না। দেখা হল না বেজিং ন্যাশনাল লাইব্রেরিও। দিনের পর দিন কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের রাজকীয় ভবনে প্রবেশ করতে গিয়ে দূর থেকে বুদ্ধদেবের ধ্যানমগ্ন মূর্তির সামনে বিশাল পুষ্প পাত্রের সামনে লেখা Gift from National Library of China লেখাটা দেখে ভাবতাম যদি চিনের জাতীয় গ্রন্থাগার দর্শন করা যায়।

চীন নিয়ে ষাটের দশকের সংঘর্ষের পর থেকে অনেক ভারতীয়র মধ্যে চীন সম্পর্কে এক ধরনের প্রীতিহীনতা জন্মেছে এদের মধ্যেও কি কোন প্রৌঢ় তেমন ধারণা পোষণ করে? প্রতিটি দিন বেঁচে থাকাটা যেখানে বড়ো বাস্তব সেখানে বৈদেশিক রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে ভাবার প্রশ্নই আসে না। জুয়াং পাশে চীনের প্রাচীরে ভারতীয় শুনে যখন চীনা যুবকটি তার শিশুটিকে আমাদের কোলে দিয়ে ছবি তুলল কিংবা বেজিঙের পথে ট্রেনে ইংরেজি জানা সহযাত্রী চীনা তরুণীটি আন্তরিকতার সঙ্গে আলাপ করে স্মারক উপহার দিয়েছিল তখন মনে হয়েছিল এই সব টুকরো ঘটনা প্রতিবেশী আমজনতা সম্পর্কে অন্য বার্তা দেয়।

কলকাতায় একটা প্রাচীন চীনা বসতি আছে। কবে কোন অতীতে বজবজে আছু সাহেবের নেতৃত্বে সে দেশ ছেড়ে এসেছিল একদল চীনা ধীবর। দক্ষিণবঙ্গের মহামান্য লক্ষ্মীকান্ত চৌধুরী তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তারা কলকাতার চর্মশিল্প ও রেস্টুরেন্ট সংস্কৃতির সঙ্গে এককার হয়ে গেলেও রয়ে গেছে বিরাট ব্যবধান। কারণ ভাষা। এই ব্যবধান কি কখনো ঘুচবে না। গত এক দশকে নাকি আমাদের দেশে চীনা পর্যটকের সংখ্যার শতকরা বৃদ্ধির হার সর্বাধিক। এই দুই দেশের সংস্কৃতিক আদানপ্রদান বৃদ্ধি পাওয়া জরুরি। তা না হলে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থেকেই যাবে।

আমাদের চীন ভ্রমণ যেন এক অর্থে পথঘাট, ঘরবাড়ি, প্যাগোডা, পাঁচিলেই সীমাবদ্ধ। এই সব ইনঅ্যানিমেট বিষয়বস্তুর সঙ্গে অ্যানিমেট অর্থাৎ মানুষজনের কাছে পৌঁছতে না পারলে কোন ভ্রমণই সম্পূর্ণ হয় না। এ পর্যন্ত পথেঘাটে বিশাল কোনো সেলিব্রিটির মুখ বা ধর্মগুরুর ছবি দূরের কথা মাও বা বর্তমান প্রেসিডেন্টের মুখও চোখে পড়ল না।

প্যারিসের মত পথেঘাটে পারফিউমের গন্ধ নেই বেজিঙে। দেড় ইউয়ান দামের চায়না ডেইলির পাতায় রোজ রাশিফল দেওয়া থাকলেও কোনো জ্যোতিষীর বিজ্ঞাপন নেই। রক্তদান শিবির বা অযাচিত প্রীতি শুভেচ্ছা জানানো ধূলিমলিন ফ্লেক্স চোখে পড়ল না বিশ্বের বৃহত্তম দলতন্ত্রর দেশে। অন্যদিকে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারতে কলকাতার মতো শহরের মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে। সাবজিরো তাপমাত্রায় রাত ন'টায় লাসার পোটলা স্কোয়ারে তিব্বতি রমনীকে পথ পরিমার্জরতা দেখেছি। একই দৃশ্য দেখেছি সাংহাইয়ে নানজিং রোডে। একটা আদ্যন্ত এশিয় দেশ কী জাদুতে পাশ্চাত্যের এই গুণ করায়ত্ত করল তা ভাবতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে। জাপান যাত্রী রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, য়ুরোপের শিক্ষাকে জাপান তার সমস্ত জটিল শিকড় এবং বিপুল ডালপালা সমেত নিজের দেশের মাটিতে একরাত্রির মধ্যেই খাড়া করে দিয়েছে। আমার বিশ্বাস রবিঠাকুর আমাদের যাত্রাসঙ্গী হলে চীন সম্পর্কেও একই কথা বলতেন।

M.T. GROUP

Estd. 1954

M.T. MECHANICAL WORKS

M.T. INTERNATIONAL

EN. EN. ENGG. WORKS

D-75, Phase - V, Focal Point,
Ludhiana - 141010 (Punjab) India
Ph: 91-161-2670128, 2672128
Fax : 91-161-2673048, 5014188
E-mail : mtgroup54@sify.com
Visit us at : www.mtexports.com

Manufacturers :
Domestic Sewing Machine & Parts, Overlock Machines, Industrial Machine, TA-1, Embroidery, Bag closer and Aari Machines

Phones : Fac : 2222224, 2222225, 2222226
Resi : 2426562, 5050350

Rai KNITWEARS

842/2, Industrial Area - A,
Backside R.K. Machine Tools Ldt.
LUDHIANA - 141003

HOSIERY MANUFACTURERS
& EXPORTERS OF:

EXCLUSIVE SCHOOL
UNIFORMS & T-SHIRTS
ALL FASHION WEARS

S.T. No. 55615216 Dt. 4-9-68
C. S. T. No. 55615216 Dt. 10-9-68

Ph. :-0161- 2510766, 2512138, 2510572
Fax No. 0161-2510968/ 2609668,
Gram : **TYRES**

HINDUSTAN TYRE CO.

Prop. : HINDUSTAN CYCLES & TUBES (P) LIMITED

Regd. Office :
G-3, TEXTILE COLONY
INDUSTRIAL AREA - A,
LUDHIANA - 141 003

Works :
KANGANWAL
G. T. ROAD
LUDHIANA - 141 120

জল ও সবুজের প্রাচুর্যই ভারতকে দার্শনীক বানিয়েছে। কর্মী করেনি। আমরা বিশ্বকে গণিতের শূন্য উপহার দেব। পানিনি পৃথিবীতে প্রথম সম্পূর্ণ গ্রামার রচনা করবে। অমর্ত্য সেন, মেঘনাদ দেশাই, মেহবুব উল হক 'মানব উন্নয়ন সূচক' উদ্ভাবন করবে কিন্তু কাগজ আবিষ্কার করে বৌদ্ধধর্মের প্রাচীনতম নিদর্শন রক্ষা করা থেকে শুরু করে বিশ্বকে অবাক করে রেকর্ড সময়ে যোগাযোগ পরিকাঠামো গড়বে চীন।

একদিন চীন নিজের বুদ্ধিমুক্তির জন্য ভারত থেকে আসা বৌদ্ধধর্মের দখিনা পবনে ঋদ্ধ হয়েছিল। তারপর ইউরোপীয় বণিক এমনকি প্রতিবেশী জাপানের হাতেও কম লাঞ্ছিত হয়নি। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে চীন তার শক্তি সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করে। 'বিত্ত হতে চিত্ত বড়' এই ভারতীয় দর্শনকে তাই মনের থেকে মানতে পারেনি নতুন যুগের ভোরে। সম্ভবত সেই কারণেই ১৯২৪ সালে বেজিং লেকচার অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণে চীনে গেলে সাংহাইয়ে কলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কবির এশিও অধ্যাত্মবাদের পুনর্জাগরণ সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় খুশি হয়নি। কিন্তু সভা পণ্ড কেন করেছিল তা আমাদের কাছে ধন্দ রয়ে গেছে।

বিদেশে এমন অভিজ্ঞতা কবির অন্যত্রও হয়েছিল। ইতালি ভ্রমণকালে তাঁকে দিয়ে মুসোলিনী নিজের গুণকীর্তন করালে ইতালিয় ভাষার অপব্যবহার প্রসঙ্গটি তাঁর সফরসঙ্গী প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ ধরে ফেলে কবিকে উদ্ধার করেন। চীনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী এলমহার্স্ট ও কালিদাস নাগ তেমন ভূমিকা হয়তো নিতে পারেননি। ভাষাও একটা বড়ো কারণ হয়ে থাকতে পারে।

সকালে ঘড়ি ধরে লিও হাজির। আমাদের গন্তব্য গ্রেট ওয়াল। বিশ্বে যেগুলো বিস্ময় তাদের প্রথম চাক্ষুষ করার মুহূর্তের রোমাঞ্চই আলাদা। আগ্রায় ছিপিটোলা রোডের হোটেল থেকে রওনা দিয়ে প্রথম দূর থেকে তাজ দেখেছিলাম। চলন্ত গাড়ি থেকে তেমনই হঠাৎ ধরা দিল গ্রেট ওয়াল। পাহাড়ের চূড়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে গেছে অজগরের মত দূরে দূরান্তরে মহাচীনের মহাপ্রাচীর।

খৃস্টপূর্ব ৭৭১ থেকে মিঙ যুগে ১৩৬৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে নির্মিত মানব সভ্যতার এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শনের সামনে এসে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। গানসু প্রদেশ থেকে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত ১৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই অবিশ্বাস্য কষ্টকর নির্মাণকার্য সঙ্গত কারণেই মনুষ্য নির্মিত সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম হয়েছে।

বর্তমানে এই দীর্ঘ প্রাচীর সুসংরক্ষিত নয়। বহু ক্ষেত্রে কালের করালগ্রাসে অস্তিত্বহীনও বলা যায়। বেজিং সংলগ্ন ৬২৯ কিলোমিটার অংশই সংরক্ষিত। যে বিখ্যাত জায়গাগুলোতে সাধারণত পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া হয় সেগুলি হল বাডালিং, জুয়ান পাস, সিমাতাই আর মুতিয়ানু। আমরা এসেছি ৭০ কিমি দূরের জুয়োন পাসে। জুন্ডু পর্বতের শেষে আর তাইহাং পর্বতের শুরুতে এই গিরিপথটি কৌশলগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

হান রাজত্বকালে জেনারেল শু ডা এবং চ্যাঙ উ এটার বর্তমান নির্মাণকার্য শুরু করে। ১৩৬৮ তে মিঙ রাজত্বকালে তা শেষ হয়। গিরিপথ আজ পিচ বাঁধানো জাতীয় সড়ক। প্রাণান্তকর খাড়াই সিঁড়ি ভেঙে গ্রেট ওয়ালে উঠে দৃষ্টিগোচর হয় নিচে বিশাল যানজটের দৃশ্য। দূরে পাহাড় ফুঁড়ে ধাবমান ট্রেন টানেলে ঢুকছে। উপরে সুবিন্যস্ত মহা প্রাচীরের সিঁড়ি।

গ্রেট ওয়ালের এই অঞ্চলকে Cloud Platform of Juyong Pass বলা হয়। চেঙ্গিশ খানের নাতি কুবলাই খান জুয়ান লেক বেসিনে এই অংশটি গড়ার উদ্যোগ নয়। আশ্চর্যের বিষয়টি হল তাঁর সময়ে ইতালিয় পর্যটক মার্কোপোলো তাঁর ভ্রমণ বিবরণীতে এই বিস্ময়কর চিনা কীর্তিটির উল্লেখই করেননি।

আমাদের দেখা জুয়াং এর তুলনায় মহাপ্রাচীরের সিমাতাই অংশটি দুর্গমতা, রোমাঞ্চ ও অদ্ভুত দর্শনের জন্য বিখ্যাত। অন্যদিকে মুতিয়ানু অঞ্চলে অজস্র শৃঙ্গ ও সবুজ উপত্যকা জুড়ে অবস্থান করছে এই প্রাচীর। স্থানে স্থানে তা মেঘে ঢাকা থাকে।

এই প্রাচীর নির্মাণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল উত্তরে মোঙ্গল আক্রমণ থেকে চীনকে রক্ষা করা। অথচ আজ সেই প্রাচীরের উত্তরে চীনের স্বশাসিত অঞ্চল ইনার মোঙ্গলিয়া।

প্রাচীর দিয়ে শহর রক্ষা দেশে দেশে সামরিক কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত। শিবাজী নাকি সাতবার সুরাট আক্রমণ করেছিলেন। তাই তাপ্তী নদী বরাবর বানানো দীর্ঘ প্রাচীর আজও বর্তমান। সেই প্রাচীর এতটাই চওড়া যে তাতে নানা রাজ্য সরকারি দপ্তর গড়ে উঠেছে। চীন সেক্ষেত্রে ইউটিলিটির এসথেটিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে সংরক্ষণে মনোযোগী। সবার আগে পর্যটকদের কাছে বাডলিং অংশ ১৯৫২ তে উন্মুক্ত হয়। নেপালের প্রধানমন্ত্রী বি.পি.কৈরালা (১৯৬০) ছিলেন প্রথম বিদেশী অতিথি। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ১৯৭২ সালে প্রথম অতিথি হয়ে গ্রেট ওয়াল দর্শন করেন।

এই বিশাল বিস্ময়কে নিয়ে কিংবদন্তীর শেষ নেই। চেঙ্গিশ খান নাকি বলেছিলেন পাঁচিল দুর্ভেদ্য হতে পারে প্রহরীরা নয়।

চীনের জাতীয়তাবাদী নেতা সান ইয়াং সেন এই প্রাচীরকে National Symbol of Chinese Consciousness বলে অভিহিত করেছেন। প্রখ্যাত চিনা লেখক লু সুন এই প্রাচীরের জয়গান গাইতে পারেননি। তাঁর মতে বস্তুত পক্ষে এটি একমাত্র অসংখ্য শ্রমিকের শ্রমের অর্থহীন মৃত্যু ছাড়া কোনো উদ্দেশ্য সাধন করেনি। মাওয়ের সংস্কৃতি বিপ্লবকালে দলের অনুগত সৈনিকদের স্লোগান ছিলঃ Arise those who do not want to be slaves. Let our flesh and blood forge our New Great Wall. সংস্কারের উত্তর যুগে দেং শিয়াও পিঙ এর আহ্বান ছিল Love our China and restore our Great Wall. অনেক প্রচারে বলা হয় এই প্রাচীর নাকি মহাকাশ থেকে দৃষ্টি গোচর হয়। এটা সত্যি নয়। কোনো সরকারি প্রচারপত্রেও এর সমর্থন মেলে না।

বিশ্বের অন্যান্য আশ্চর্যের মতো এখানেও ঢল নেমেছে সারা পৃথিবীর মানুষজনের। আলাপ হল এক ইরানি মাঝবয়সি দম্পতির সাথে। একসঙ্গে ওয়াচ টাওয়ারে উঠল এক আমেরিকান চিকিৎসক। জর্ডন থেকে অস্ট্রেলিয়া সকলেই এসেছে এই প্রাচীর দেখতে। তারই মধ্যে নজর কাড়ছে চীনেরই দক্ষিণ পূর্বের বিশেষ ঝলমলে পোশাক পরা জনজাতিরা। অনেকেই তাদের সঙ্গে ছবি তুলতে ব্যস্ত। একমুখ হাসি আর গ্রাম্য সরলতা নিয়ে তারা সম্মতি জানাচ্ছে নির্দিধায়। এখানেই বোঝা যায় এরা Simple Asian Chinese, সফিসটিকেটড ওয়েস্টার্ন নয়।

একদিন বেজিং ছিল বিশ্বে বৃহত্তম সাইকেল সমাবেশের শহর। আমাদের দেশে পুণাতেও ৮০-র দশকের গোড়ায় নিমেষে চারমাথায় হাজার সাইকেল দাঁড়িয়ে যেতে দেখেছি। দেখেছি পথের ধারে সাইকেল স্ট্যান্ডে সাইকেলের সমাবেশ। বিশ্বে বেজিংয়ের পর দ্বিতীয় সাইকেল ক্রাউডেড সিটি হিসেবে পুনার খ্যাতি ছিল। আজকের পুণা সাইকেল শূন্য বলা যায়। একই দৃশ্য বেজিঙেও। উঠতি বড়লোকের মানসিকতায় আক্রান্ত হয়ে দুটি শহরই বুঝিয়ে দিল তারা তৃতীয় দুনিয়ার। অথচ বিশ্বে সাইকেল-স্বর্গ নেদারল্যান্ড আজও প্রয়োজনকে পরিবেশ বান্ধব বানিয়ে মর্যাদা দিয়ে চলেছে এই দু'চাকার যানকে। সম্প্রতি সেখানে বৈদ্যুতিন সাইকেল চালু হয়েছে।

সাঙহাই। নয়া চীনের বাণিজ্যিক রাজধানী। সিটি এয়ারপোর্ট আর রেল স্টেশনের সহাবস্থান। আকাশ ছোঁয়া বহুতলের অরণ্যে সাজানো চীনের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী। মাথায় খাটো, সপ্রতিভ পল আমাদের প্রায় হাইজ্যাক করে গাড়িতে তুললো। পরনে তার বাদামি চিনো আর রাউন্ড নেক নীল ফুলস্লিভ গেঞ্জি। পায়ে স্নিকার, পিঠে মানানসই হ্যাভারস্যাক। আমেরিকান অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলছে।

আলাপের সময় জানা গেল জিয়াংশি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ৮০০০০ ইউয়ান খরচ করে পর্যটন ব্যবস্থাপনায় সে চার বছরে স্নাতক হয়েছে। বর্তমানে এই ডিগ্রির কোর্স ফি এক লক্ষ ইউয়ান। পলের চীনা নাম জিয়াংশিয়া। ওর বাবা ডাক্তার ছিলেন। বর্তমানে শহরের এক সুপার মার্কেটে হোসিয়ারি পণ্যের দোকান খুলেছেন। চিকিৎসক হয়ে ব্যবসা করার কারণ জানতে চাইলে পল জানালো ওর এক দিদি আছে, চাকরি করে। তারপর তার জন্ম হলে One child নীতি না মানার জন্য ওর বাবার সরকারি হাসপাতালের চাকরি যায়। কোনো নাসিংহোমে বা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করলেন না কেন জানতে চাইলে পল জানালো চীনে প্রাইভেট নাসিংহোম নেই বললেই হয়। সর্বোপরি তাঁর লাইসেন্সও বাতিল করা হয়েছে। কয়েক বছর হল চীনে এক সন্তান নীতি উঠে গেছে। বর্তমানে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পল কি খুশি? জানতে চাইলে এক দার্শনিক উত্তরে সে বলল, If you are rich and happy, it matters little what the system is. এক সন্তান নীতি বাতিল হওয়ার পর তার বাবা আবার লাইসেন্স ফিরে পেয়েছেন কিনা জানা হয়নি।

পল যারপরনাই চিন্তিত শহরের যানযট নিয়ে। বারো দিনের চীন ভ্রমণে সাংহাইকে দিয়েছি আমরা মাত্র ১২ ঘণ্টা। তাই লাগেজ গাড়িতে রেখেই শুরু হল শহর দর্শন। জেড বুদ্ধমন্দির দেখে এসে গেলাম হুয়াংপু নদী তীরে। সাংহাই এখানে হংকংয়ের প্রতিস্পর্ধী। এ নগরীতে এসে হুয়াংপু রিভার ক্রুজে অংশ নেয়নি এমন ট্যুরিস্ট বিরল। নদীর পশ্চিম তীরে বিখ্যাত বান্ড। পূর্ব পাড়ে অপেক্ষাকৃত নবীন অঞ্চল লুজিয়া জুই। পশ্চিম পাড়ে দাঁড়িয়ে হতবাক হতে হয় অন্য পাড়ের সারি সারি আকাশ ছোঁয়া আধুনিক স্থাপত্য কীর্তি দেখে। ৪৬৮ মিটার উঁচু ওরিয়েন্টাল পার্ল রেডিও টিভি টাওয়ার, পাশ্চাত্য ও চীনা শৈলীর সমন্বয়ে নির্মিত অবজার্ভেশান ডেক ও সর্বোপরি বিশ্বে উচ্চতম (৪৯২ মিটার) World Financial Centre -এর মতো বিল্ডিংগুলো নিঃসন্দেহে সাংহাইকে বিশ্ববিখ্যাত করেছে।

নদীর পূর্বপাড়ে যেখানে সবটাই আধুনিক, পশ্চিমপাড় সেখানে প্রাচীনত্বের দাবিদার। ১৮৪৬ সাল থেকে নিজেকে তিল তিল করে সাজিয়ে তুলেছে এ পাড়ের বান্ড তথা ঝঙ শাঙ ডঙ ই রোড। নানান সরকারি ভবন, কুল ডক বিল্ডিং, শহীদ স্মৃতি স্মারক, সাংহাই পুডিং ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক ও একের পর এক হোটেলগুলি বয়স ও অবয়বের বিভিন্নতা সত্ত্বেও

এলিগেন্সের দিক দিয়ে এতটুকু ছন্দপতন ঘটায়নি। এক অসাধারণ পরিমিতিবোধে সৃষ্টি করেছে চমকপ্রদ সুসংহত ছবি।

রিভার ক্রুজের টিকিট কেটে আনলো পল। পঞ্চাশ মিনিটের এই নদীভ্রমণ নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। গোধূলি লগ্নে আলোকমালায় সজ্জিত নভোচারী হর্ম্য ও সেই সঙ্গে নদীর জলের সহাবস্থানে সাঙহাই যেন নিজেকে নিলাম করে দিল।

সেই কোন সকালে বেজিং থেকে রওনা দিয়েছি। ঝাবেই অঞ্চলে হলিডে ইন এক্সপ্রেস হোটেলের ১৬ তলায় এসে উঠলাম ক্লান্ত শরীর নিয়ে।

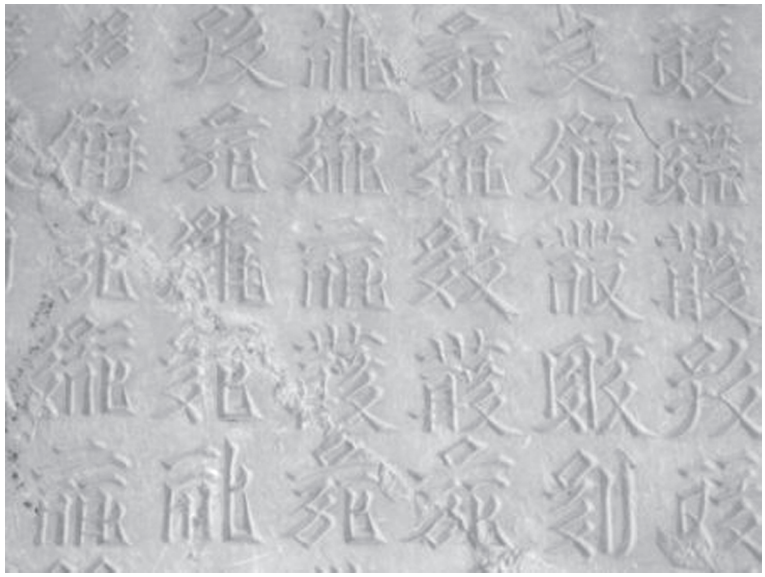

য়ুয়ানগুয়ান ইয়ুনতাই পাথর।

ভ্রমণের শেষ দিনে আমাদের দ্রষ্টব্য সাংহাই মিউজিয়াম। বয়সের তুলনায় ছেলেমানুষ এই সংগ্রহশালাটির জন্ম ১৯৫২ তে। রেনমিঙ রোডের বর্তমান ভবনটি ১৯৯৬-এ নির্মিত। এখানকার দশলক্ষ সংগ্রহের মধ্যে একলক্ষের বেশি সংগ্রহ জাতীয় সম্পদের দাবিদার। ব্রোঞ্জ, সিরামিক, চিত্রকলা, জেড পাথরের দ্রষ্টব্যগুলি সত্যিই দর্শনীয়। শান ওয়েই এর আঁকা 'হারমিট্স' বা তাঙ ইং-য়ের সৃষ্টি 'লেডি ইউথ ফ্যান' ছবিগুলো মনে রাখার মতো। প্রাচীন চৈনিক বিশ্বাস পৃথিবী বর্গাকার এবং আকাশ গোল এই দর্শনকে মাথায় রেখে চতুষ্কোণ ভিত্তির ওপর বৃত্তাকার এই ভবনটি চিত্তাকর্ষক। অডিও গাইড, মাল্টিমিডিয়া স্টুডিও, গ্রাফিক্স হল থেকে শুরু করে রেষ্টুরেন্ট, কাফেটেরিয়া সমৃদ্ধ এই আধুনিকতম সংগ্রহশালাটির বৈভরের তুলনায় সংগ্রহর আকর্ষণ কম বলেই মনে হল। বিশেষ করে ভাস্কর্য ও চিত্রকলার দিক দিয়ে সালারজঙ বা ইউরোপের অনেক ছোট শহরের মিউজিয়ামের তুলনায় সাংহাই খুবই দীন।

পাশেই সাংহাই গ্র্যান্ড থিয়েটারের তাক লাগানো ভবন। কী বিশালত্ব কী আধুনিকতা সব দিকদিয়েই চমকপ্রদ ফরাসি স্থপতির গড়া এই দশতলা বিল্ডিংটি। আধুনিক বাস্তুবিজ্ঞানের চমক হিসেবে নিজেকে যেন হাজির করছে সাংহাই। এইসব ভবন ও তার পারিপার্শ্ব দেখলেই নিজেদের দৈন্য বড়ো বেশি পীড়া দেয়। পূর্ব গোলার্ধের প্রাচীনতম কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের চারপাশের কথা মনে আসে। রাশভারি ঐতিহাসিক এই ভবন সংলগ্ন ফুটপাথটা ছোটবেলা থেকেই দেখছি শাসন করে বেআইনি দখলদার দুর্বৃত্তরা। ফলে যা হবার তাই ঘটছে। কেবল বিদেশি পর্যটকই নয়, কমছে মূল্যবান দ্রষ্টব্য। সেইসঙ্গে রহস্যজনকভাবে প্রাতঃভ্রমণে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছেন মিউজিয়াম আধিকারিক।

অদূরেই পিপলস্ স্কোয়ারের মেট্রো স্টেশন। সাংহাই মেট্রো বেজিঙের চেয়ে বিস্তৃত। ১৬টি লাইনে এর স্টেশন সংখ্যা ৩৫০ এর কিছু বেশি। পাশেই বিখ্যাত নানজিঙ রোড শপিং সেন্টার। টয়ট্রেন চলছে রাস্তায়। এই সকালেই জনতার ঢল। হরেক রকমের মনোরঞ্জনের হাতছানি। বেকারি থেকে হোসিয়ারি, জুয়েলারি থেকে ইটারি মায় পণ্যাঙ্গনাদের উপস্থিতিও চোখে পড়ার মতো। বহুবল্লভা বন্দরনগরী এখানে স্বয়ম্বরা। সবই আছে নেই কেবল সবুজ প্রকৃতির সান্নিধ্য। শীতল মরুভূমি থেকে সমতল ও পার্বত্য ভূপ্রকৃতি দেখে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব চীন সাগর তীরে এসে একটিও নারকেল গাছ দেখলাম না। এতবড় শহরকে পর্যটকের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে অন্তত তিন দিন দরকার, সেখানে মাত্র বারো ঘণ্টার ঝাঁকি দর্শন দিয়েই আমাদের চীন ভ্রমণ সমে এসে থামল।

লাসা থেকে সাংহাই কোনো হোটেলেই ঘরে খবরের কাগজ পেলাম না। শহর ঘোরার সময় তেমন চোখেও পড়ল না নিউজপেপার বা ম্যাগাজিনের স্টল। সংবাদপত্রে কোথাও তেমন রাজনৈতিক সমস্যামূলক সংবাদ নেই। ইউরোপ বা আমাদের দেশের মুম্বাইকারদের মতো কোনো ডেইলিতে মনোযোগী মেট্রোযাত্রীও চোখে পড়ল না। সকলেই যেন সফটওয়্যারে প্রোগ্রাম করা।

চীনাদের দৈনন্দিন জীবনে কতগুলো জোরালো দিক মুগ্ধ করার মত। অনেক ব্যাপারেই এরা সিরিয়াস, বেশ জোরের সঙ্গে করে। বেজিং ও সাংহাই দুটো শহরেই সন্ধ্যার পর একটি দৃশ্য নজর কেড়েছে। বেজিংয়ে শপিং মল সংলগ্ন প্রশস্ত শান

বাঁধানো লনে জুৎসই গানের ক্যাসেট চালিয়ে নরনারীকে নৃত্যরত দেখেছি। গানগুলো অ্যানডেন্ট ঢঙ-য়ের ধীর লয়ে, যার সঙ্গে তাল রেখে অঙ্গ সঞ্চালন করা যায়। পথ চলতি মানুষজন দাঁড়িয়ে তা উপভোগও করছে। অধিকাংশই বয়সে প্রৌঢ়। এটা এরা শরীরচর্চার অঙ্গ হিসেবে নেয়। সাংহাই রেল স্টেশন সংলগ্ন অঙ্গণেও দেখেছি একই দৃশ্য। সেখানে নানা বয়সের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেক নারী পুরুষকে হাতধরাধরি করেও বলনাচে অংশ নিতে দেখা গেছে। সচ্ছন্দে সে দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করতে গেলে কেউ আপত্তিও করেনি।

ফ্যাশান ও সু-অভ্যাস আমদানি করতে কোনো শুল্ক লাগে না। আমাদের কার্জন পার্কে বা সিটি সেন্টারে এ দৃশ্য ভাবা যেতেই পারে। আমাদের শহরে রাস্তায় নিত্য নতুন চালু হওয়া শনিপুজোর বদলে এমন স্বাস্থ্যকর ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান কম জরুরি নয়। গুরুসদয় দত্ত তাঁর ব্রতচারী আন্দোলন শুরু করেছিলেন, যা গ্রাম ছেড়ে শহরে এলোই না।

এই চীন ভ্রমণের পরতে পরতে মনে হল আমরা যেন কোনো গৃহস্থের নবনির্মিত ভবনে গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণে এসেছি। প্রতিটি শহরে যেন নতুন রঙের গন্ধ। প্রতিটি বাহন যেন সদ্য শোরুম থেকে আনা। আজ এই বিদায় লগ্নে চীন যদি Feed back চায় তাহলে প্রথমেই বলব সাংহাইয়ে রিভারক্রুজে গোয়ার মত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চালু করতে যেখানে চীনা ফোক সঙের সঙ্গে ইন্ডিয়ান ফোক কিংবা বেজিং অপেরার সঙ্গে ম্যাকাও-য়ের পর্তুগীজ ডান্স এই নদী ভ্রমণকে অন্য মাত্রা এনে দেবে। এছাড়া নয়া চীনের সরণি সঙ্গমগুলো ভাস্কর্য দিয়ে সাজাতে পারলে শহরগুলো হয়ে উঠবে অনেক বেশি প্রাণবন্ত। সেই সঙ্গে পর্যটকও পরিচিত হবে চীনের দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, রামকিঙ্কর বেজ বা চিন্তামণি কর-এদের সঙ্গে।

সাংহাই হোঙকিয়াও ইন্টারন্যাশানাল এয়ারপোর্টে এসে এক অদ্ভুত মানসিকতায় আক্রান্ত হলাম। স্তাঁধাল এফেক্টের মতো এটাকেও কি 'সাংহাই এফেক্ট' বলা যায়? এতদিন যেন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। গন্তব্যে পৌঁছানো, হোটেলে ওঠা, দ্রষ্টব্য দর্শন এই প্রাত্যহিকতার মধ্যে জাবর কাটার অবকাশ ছিল না। সফর থামায় যেন সেই অবকাশ মিলল।

সাংহাই রেল স্টেশনে দেখছিলাম আস্তাবলের ঘোড়ার মত সারি সারি হাঙরমুখো ট্রেন। তা দেখে ভাবছিলাম গত সত্তরের দশকেও এই দেশ ইংরেজি ভাষার সঙ্গে রেল পরিবহণে আমাদের তুলনায় কতো পিছনে ছিল। বিশ্বে উচ্চতম স্টেশনের নাম ঘুম লিখতে গিয়ে শ্লাঘা বোধ করতাম। ষাটের দশকে চীনে দুর্ভিক্ষে তিন কোটি লোকের মৃত্যুর অন্যতম কারণ ছিল রেল পরিবহণের অপ্রতুলতা। আজকের চীন কেবল দ্রুতগতির রেল পরিবহনই নয়, সুপার হাইওয়ে ও সুলভ বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিপ্লব করে পরিকাঠামোয় সুপার পাওয়ার হিসেবে হাজির। সফর পথে চোখে পড়া বাড়ির মাথায় সোলার যন্ত্র সদর্পে যেন সে কথা ঘোষণা করেছে।

মানুষের টাকা করার যেমন নেশা থাকে উন্নয়নেরও নেশা থাকা উচিত। চীনের এই সাফল্যকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী অনেক আগেই বুঝেছেন। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন চার বার তিনি চীন সফর করেন। ভারতে চীনা বিনিয়োগের ৩১ শতাংশই গুজরাটে। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বে ভারতে প্রথম বিদেশী রাষ্ট্রনায়কটিও চীনের প্রেসিডেন্ট।

লাসার হোটেলে আলাপ হওয়া কাসগড় থেকে আসা তরুণ ইঞ্জিনিয়ার চেতন পারেখ তার সমগ্র যাত্রাপথে নিরবচ্ছিন্ন ফোর জি পরিষেবার কথা বলছিল। বাইদু, আলিবাবা, টেনসেন্ট এগুলো চীনের তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা, আমাদের যেমন ইনফোসিস, উইপ্রো। চীনের অর্থনীতিতে এই সংস্থাগুলি চার শতাংশ দখল করে আছে। আন্তর্জাতিক বিগ বসদের তুলনায় এই সংস্থাগুলোকে সরকারের বেশি সুযোগ দেওয়ায় নাকি এই সাফল্য। অন্যদিকে আমাদের দ্বার গুগল, ফেসবুকদের জন্যই বেশি উন্মুক্ত। ভারতের বৃহত্তম ডিজিটাল সংস্থা ফ্লিপকার্টের ৮০ শতাংশই বিদেশী মালিকানায়। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর উভয় সংকট। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' সফল করতে গিয়ে একদিকে অতীতে 'শিশু শিল্প' নীতির ফলে 'বুড়ো খোকাদের' বাড়বাড়ন্তর শিক্ষা বড়ো বাধা, অন্যদিকে বিশ্বায়নের সুযোগও নিতে হবে।

বৌদ্ধধর্মের বিপননের যে চিরচরিত সুযোগ এ যাবৎ আমরা পেয়ে এসেছি তার যথাযথ সদ্ব্যবহারে সফল হইনি এটা বলাই যায়। মুসলিম দুনিয়ায় আরব দেশ যেমন পর্যটক আকর্ষণ করে, বৌদ্ধ বিশ্বে ভারত এখনও তেমনটি হতে পারেনি। ভারতে বৌদ্ধ পর্যটনের এই অহল্যা জমিটিকে কর্ষণযোগ্য করার লক্ষ্যে গত ২০০৭ সালটিকে ভারত-চীন মৈত্রী বর্ষ হিসেবে পালিত করার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত সরকার। চীন বর্তমানে বিশ্বে বৃহত্তম পর্যটক উৎপাদনকারী দেশ হতে চলেছে, অথচ বিশ্ব ভ্রমণকারি চীনা পর্যটকের মাত্র ০.১ শতাংশ আসে তারই প্রতিবেশী বুদ্ধভূমি ভারতবর্ষে। ভাষা ছাড়া এর অন্য কারণ হল বৌদ্ধধর্ম তথা ভারতের প্রতি চীনাদের অনাগ্রহ। আজকের চীনাদের ৯৫ শতাংশই রিক্রিয়েশন ট্যুরিস্ট। চিনে যেখানে বছরে ৫০ মিলিয়ান বিদেশী পর্যটক আসে আমাদের ভারতে আসে ৫ মিলিয়ন। অথচ ইংরেজি বলা ও ইংরেজি বোঝা দেশ হিসেবে আমাদের ছিল বাড়তি সুবিধা। এছাড়া

চীনের তুলনায় আমাদের দরজা ছিল অনেক আগে থেকেই দোহাট করে খোলা। সর্বোপরি চীনের পর্যটনের ৯০ শতাংশ সে দেশের পূর্বাঞ্চলের বারোটি জেলায় সীমাবদ্ধ। ভারতে সেখানে পর্যটনের ৮০ শতাংশ ১৬টি রাজ্য জুড়ে। হিমালয় ছাড়া সমুদ্র সৈকতেও চীনের তুলনায় ভারত বেশি ঋদ্ধ। আমরা দুর্বল যোগাযোগ পরিকাঠামোয়। চীন তাই তার রেশম সড়ককে কেন্দ্র করে অনগ্রসর পশ্চিমাঞ্চলে পর্যটনের বিকাশে মনোযোগী। ষাটের দশকে মাওয়ের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উন্মাদনায় বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন নষ্ট হওয়ার পর চীনের বিলম্বিত বোধোদয় ঘটেছে। তাই তারা আজ শাক্যমুনিকে সর্বত্র সশ্রদ্ধায় সংরক্ষণে যারপরনাই ব্যস্ত।

এশিয়ার দুই প্রাচীন সভ্যতা ভারত ও চীনের ইতিহাসকে পাশাপাশি রাখলে দেখা যায় ভারতে বেদ মহাকাব্যের যুগে চীনের উত্তরাঞ্চলে শাঙ রাজবংশ রাজত্ব করত। পরবর্তীকালে সম্রাট অশোকের হাতে যখন মৌর্য ভারত গান্ধার থেকে শ্রীলঙ্কায় বিস্তৃত হল চ'ইন রাজবংশ তখন গড়ে তুলল ঐক্যবদ্ধ চীন। চীনের দীর্ঘতম এই সাম্রাজ্যের সময় ভারতে দেখা দিয়েছিল স্বর্ণময় গুপ্ত যুগ। কুইন শাসকরা খৃস্টপূর্ব যুগে কেবল গ্রেট ওয়াল বা টেরাকোটা আর্মিই গড়েনি, ব্যাকুল হয়েছিল গুপ্তযুগের সংস্কৃতভাষা ও তথাগত বুদ্ধকে আত্মস্থ করার জন্য। চীনের বৌদ্ধিক জাগরণে ভারতের অবদান এই সময়েই সর্বাধিক।

এরপরেই দু'দেশের ইতিহাস ভিন্নমুখি হয়। তাঙ (৬০০-৯০০ খৃঃ), শাঙ (৯০০-১২০০ খৃঃ) এবং মিঙ (১৩০০-১৬০০ খ্রীঃ) রাজবংশগুলি যখন চীনে 'গুপ্তযুগ' রচনায় মনোযোগী ভারতে তখন ঘনিয়ে এল ২০০ বছরের ঘটনাহীন স্থবিরতা। তল্পিতল্পা সমেত বৌদ্ধধর্ম হল ভারত ছাড়া। এই সুযোগে শুরু হল একে একে ৩০০ বছরের তুর্কি সুলতানি আমল, ১৫০ বছরের মোগল ও ২৫০ বছরের ব্রিটিশ শাসন। ভারতের মতো চীনে কোনো মুসলিম আক্রমণের ইতিহাস নেই। নেই ইংরেজ শাসনের মতো দীর্ঘ ঔপনিবেশিক অতীত। আমাদের মোগল ইংরেজ আমলে চীন শাসিত হয় মঙ্গেলিয়া থেকে আসা মাঞ্চু রাজবংশের দ্বারা।

গত তিন চারশো বছরে আইন, ব্যবসা, রাজস্ব, প্রশাসন, শিক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারত যতো পশ্চিমমুখি হয়েছে ততো কমেছে ইন্দো-চীন যোগাযোগ। ফলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়ায় যে বিশাল প্রবাসী ভারতীয়র দেখা পান তেমনটি চীনে ভাবাই যায় না। লন্ডন, নিউঅর্ক এমনকী হংকংয়ের তুলনায় বেজিংয়ে ভারতীয় নেই বললেই হয়।

এই সময়কালে যত ভারতীয়কে তিব্বতে দেখা গেছে তেমনটি চীনে ঘটেনি। প্রিন্স দ্বারকানাথ, রামমোহন, শরৎচন্দ্র দাস, স্বামী অভেদানন্দ প্রমুখ কালজয়ী পর্যটক ইউরোপ আমেরিকা তিব্বত গেলেও ঘরের কাছে পরশি চীন ব্রাত্য থেকে গেছে। চীন যাত্রী ভবঘুরে চূড়ামণি রাহুল সাংকৃত্তায়ণ 'ভলগা থেকে গঙ্গা' লিখেছেন। বুলেট ট্রেনের জানালা থেকে হোয়াং হো দর্শনের সময় মনে হয়েছে Yellow-Ganges Trip লেখার মত রসদ ও সময় দুটোই এ যাত্রায় পেলাম না।

এক বিচিত্র হিন্দু জাড্যে আক্রান্ত আমাদের এই অচলায়তনে সুভদ্রের মতো প্রথম উত্তরের জানালা খুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও পরবর্তীকালে ডাক্তার দ্বারকানাথ কোটনীশ। কবি দুবার চীন ভ্রমণ করেন ১৯২৪ ও ১৯২৮-এ। রবীন্দ্রনাথের ২৬ বছর আগে হংকং ও ক্যান্টনে পদার্পণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

চীনের ইতিহাসে একটা বড়ো অংশ জুড়ে আছে Opium War ১৮৩৯ সালে চীনের মাঞ্চু সম্রাট ইউরোপীয় বনিকদের এই সর্বনাশা ব্যবসার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধে সামিল হলে বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি এমনকি জাপানও দানবীয় শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হংকংয়ে ব্রিটেন ও ম্যাকাওয়ে পর্তুগীজরা তাদের শক্তি বৃদ্ধি করে। জার্মান লেখক থিওডোর ক্রিস্টলিয়েবের The Indo-British Opium Trade শীর্ষক এক বিখ্যাত লেখার ভিত্তিতে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'চীনে মরণের ব্যবসায়' নামে এক অসামান্য প্রবন্ধ লেখেন। লেখার শুরুতে তিনি বলেন, 'একটি সমগ্র জাতিকে অর্থের লোভে বলপূর্বক বিষপান করানো হইল। এমনতরো নিদারুণ ঠগীবৃত্তি কখনো শুনা যায় নাই। চিন কাঁদিয়া কহিল, 'আমি অহিফেন খাইব না।' ইংরেজ বণিক কহিল, 'সে কি হয়?' চীনের হাত দুটি বাঁধিয়া তাহার মুখের মধ্যে কামান দিয়া অহিফেন ঠাসিয়া দেওয়া হইল। দিয়া কহিল, 'যে অহিফেন খাইলে তাহার দাম দাও।'

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ হংকংয়ে চীনা রমণীর কর্ম সাধনায় মুগ্ধ হয়ে অভিন্ন উপসংহারে এসেছিলেন। চীনা নৌকায় সমগ্র পরিবারের কর্মকুশলতায় মুগ্ধ রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ এ লিখেছেন, 'কাজের শক্তি, কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে এমন পুঞ্জীভূত ভাবে একত্রে দেখতে পেয়ে আমি মনে মনে বুঝতে পারলুম, এই বৃহৎ জাতির মধ্যে কতখানি ক্ষমতা দেশজুড়ে সঞ্চিত হচ্ছে। ....চীনের এই শক্তি আছে বলেই আমেরিকা চীনকে ভয় করেছেন। ....এই এত বড় একটা

শক্তি যখন আমাদের আধুনিককালের বাহনকে পাবে, অর্থাৎ বিজ্ঞান যখন তার আয়ও হবে তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন শক্তি আছে। একই সঙ্গে দুঃখ করে কবি বলেছেন 'ভারতবর্ষে' এই দাবি কবে দেখতে পাব?

১৮৯৩ তে স্বামীজীর হংকং বর্ণনাতেও একই অনুভূতি, একই আক্ষেপ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, Hongkong next, you feel that you have reached China.....All labour, all trade seems to be in their hands. ...The boat man lives in the boat with his family. Almost always the wife is at the helms managing one with her hands and the other one with her feet.... The extreme poverty is one of the causes why the Chinese and the Indians have remained in a state of mummified civilization.

বেশ ক'বছর আগে ভুবনেশ্বরে এক সম্মেলনে আসা ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা অধ্যাপক ডঃ লিউয়ের সাথে আলাপ হয়েছিল। সে জানিয়েছিল চীনের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এক কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে। এখানকার সমাজব্যবস্থায় যে খোলা বাতাস বইছে তাকে কোনো ভাবেই কমিউনিজম দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। লিউ বলেছিল, আজকের চীনের এই সাফল্যের জন্য তিয়েন আন মেনের মানবাধিকারের মাশুলটা যথেষ্ট বেশি। তার মতে চীনে একটা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী অর্থনীতি আর কমিউনিস্ট সরকার চলছে।

১৯৮৯ সালে তিয়েন আনমেন স্কোয়ারে প্রায় তিন হাজার ছাত্র হত্যার ঘটনা প্রমাণ করেছিল সে দেশের নতুন প্রজন্ম গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের জন্য কীপরিমাণ অধীর। আমাদের দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের সুখি ঘেরাটোপে লালিত হয়ে বহু বামপন্থী নেতা সেদিন এই নরমেধ যজ্ঞকে দু'হাত তুলে সমর্থন করেছিল। তারাই এখানে মানবাধিকার নিয়ে খুবই সরব। আজও তারা বিশ্বাস করে ঐ ঘটনা পশ্চিমি প্রচার মাধ্যমের রটনা।

যুগের দেওয়াল লিখন মেনে চীন যেভাবে বিশ্বে নিজেকে মেলে ধরেছে তার প্রধান কৃতিত্ব অবশ্যই দেঙ জিয়াও পিঙের। মাও জে দঙের সমসাময়িক নেতাদের মধ্যে দেং-ই ছিলেন প্রবীণতম। চীনের অর্থনৈতিক সংস্কারের তিনিই ছিলেন মূল প্রবক্তা। 'মার্কসবাদ অবিনশ্বর, কারণ ইহা সত্য' এই ধরনের ভাববাদী ভ্রান্তিতে দেং কখনো ভুগতেন না। আদর্শগত বিচ্যুতির ক্ষেত্রে দেঙের যুক্তি ছিল, 'বিড়াল সাদা কি কালো সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা হল সে ইঁদুর ধরতে পারে কিনা।' সে দেশের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা, আন্তঃরাজ্য অভিবাসন, শ্রম আইনের পরিবর্তন, বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশ প্রভৃতি নানা মাপের বদল ঘটিয়ে দেং চীনকে একটা শক্তিশালী বিকাশশীল দেশে পরিণত করেছিলেন।

ইঁদুর শিকারি বিড়ালের তুলনাটা দেঙের ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকের মতে, 'বিড়ালের নয়টি আয়ু', কথাটা দেঙের ক্ষেত্রেও খাটে। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি বার বার ক্ষমতার লড়াইয়ে ছিটকে গিয়েও শেষ দু'দশক সর্বময় কর্তা হয়েছিলেন। রোলস রয়েস গাড়ির ক্ষেত্রে একসময় বিজ্ঞাপনে বলা হত, 'তেল ফুরোলেও সেই গাড়ি অনেকটা পথ যায়।' দেঙের ক্ষেত্রেও তা কম বেশি সত্যি হয়েছিল। শেষ এক বছর তিনি কেবল শারীরিক ভাবেই অক্ষম ছিলেন না, মানসিক ভাবেও ছিলেন ভারসাম্যহীন। তবুও চালিয়েছেন সরকার এবং পার্টি।

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন অ-স্তালিনীকরণের হাওয়া বইছিল, তখন এই দেং, মাওয়ের সামনেই মাওবাদের বিরোধিতা করে চেয়ারম্যানের কোপানলে পড়েন। এমনকী Great leap forward ও সংস্কৃতি বিপ্লবের সর্বনাশা পরিণতির সম্ভাবনার কথা বলায় ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত দেং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার শিকার হন। তবুও তাঁর অবস্থা লিউ শাও চি, কিংবা লিন পি আও এর মতো হয়নি। বরং পরবর্তী কালে মাও পত্নী মাদাম চিয়াং সহ চার চক্রীকে বিদ্ধস্ত করে উঠে এসেছেন ক্ষমতার শীর্ষে। তাঁর এই সাফল্যের মূলে হল পার্টি নিয়ন্ত্রিত বন্দুকের নলের ওপর অবিচল আস্থা।

গণতন্ত্র ছাড়া নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের দিকে যাবার যে বিপ্লব অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দেং ঘটিয়েছেন তা কৃতিত্বের দাবি রাখে। একথা ঠিক, গর্বাচভের থেকে শিক্ষা নিয়ে দেং চীনের ইয়েলতসিন হতে চাননি। চীনকে বিশ্বের বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বী করতে দ্বার খুললেও ইয়েতসিনের মত বলেননি 'সত্তর বছরের কমিউনিজম আমাদের দেশের বৃহত্তম ট্র্যাজেডি। তাই তিয়েন আন মেন ট্রাজেডির মধ্যে তাঁর ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়েছে সেই মোটা বিড়াল।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে চীনের এই পালাবদল অবশ্যই অতীতের অর্থনৈতিক সংকটের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলা যায়। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬১ এই সময়কালে চীনে ৩ কোটি মানুষের দুর্ভিক্ষে মৃতুকে সে দেশের গণতন্ত্রহীন প্রশাসনের উগ্র রাজনৈতিক মতান্ধতার ফল বলে বর্ণনা করেছেন অধ্যাপক অমর্ত্য সেন। অন্যদিকে ভারতবর্ষের গণতন্ত্র ১৯৫০ সালের পর এটাও দুর্ভিক্ষ ঘটতে দেয়নি।

অর্থনীতি বহির্ভূত ক্ষেত্রগুলিতে চীনের নজর কাড়া এই

সাফল্যের অন্যতম কারণ হল সেখানকার সমাজে ভারতের মত Pluralism বা বহুত্ববাদের অস্তিত্ব না থাকা। সেখানকার আশি শতাংশের বেশি লোকের একটাই ভাষা। ধর্মগত ভাবেও চীনের সমস্যা ভারতের মত নয়। কয়েক বছর আগে চীনের পশ্চিমাঞ্চলে ওয়াইঘুর সিনজিয়ান প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ তুর্কি বংশোদ্ভব মুসলিমরা উগ্রবাদী আন্দোলন করলে চীনা প্রশাসন মধ্যযুগের পর্তুগালের মত ক্রুশেডের সাহায্য নিয়ে সেই বিদ্রোহ দমন করে। দলাই লামার তিব্বতেও মাওয়ের চীনকে জম্মু-কাশ্মীরের মত বাস্তবের মুখোমুখি হতে হয়নি।

আর্থ-সামাজিক বিকাশের এমন প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করলেও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিচারে চীনের সাফল্য মোটেই উল্লেখ করার মত নয়। আমাদের দেশে যেমন মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব, গোয়ার সঙ্গে বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, অসমের তফাত, চীনেও তেমনি পূর্বউপকূলের তুলনায় পশ্চিম প্রান্তের রাজ্যগুলোর বৈষম্য অনেক বেশি। কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতের চেয়েও বেশি।

চীনের রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা অনেকের কাছে কেবল অস্বচ্ছই নয় দুর্বোধ্যও বটে। রাজনৈতিক ভাবে দেশটা এক বাতিল মতাদর্শকে আঁকড়ে আছে আবার অর্থনৈতিকভাবে সে নির্মমভাবে বাস্তববাদী। আমাদের মতো কলকাতা নির্ভর বাঙালির চিন্তায় চর্চায় মননে রাজনীতি যতটা জায়গা জুড়ে থাকে একজন গড় বেজিংবাসীর কাছে তা নয়। এদের কাছে প্রতিটি দিনকে আর্থিক ভাবে মোকাবিলা করা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং। কাগজে দেখলাম বেজিং পাতাল রেলের ন্যূনতম টিকিট দু'ইউয়ান থেকে এক ধাক্কায় চার ইউয়ান হবে। চার ইউয়ান আমাদের মুদ্রায় ৪৮ টাকা। রুটি থেকে মাংস চীনে আমাদের তুলনায় এগারো থেকে বারো গুণ বেশি দামি। মাথা পিছু আয়ে যে চীন ভারতের চেয়ে দেড় গুণ ধনী সেখানে জিনিসপত্রের দাম নিঃসন্দেহে ভয়ানক মুদ্রাস্ফীতি ঘোষণা করে।ব্যতিক্রম কেবল জ্বালানি তেলে, আমাদের দেশে পেট্রোল যখন ৭১ টাকা লিটার চীনে তা ৮২ টাকা।

অনেকে মনে করে আমাদের দেশে ন্যাশানাল অ্যাকাউন্টস স্ট্যাটিসটিক্স, রিপোর্ট অন কারেন্সি অ্যান্ড ফিনানস বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন যতোটা স্বচ্ছ চীনে তেমনটি নয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ২০১৩ সালে এক বিস্ফোরক তথ্য হাজির করেছে চীনের ন্যাশানল ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিক্স। চীন কর্তৃপক্ষ অবশেষে স্বীকার করেছে যে সরকারি পরিসংখ্যানের অনেকটাই সেখানে অতিরঞ্জিত। সে দেশের কেবল ইউনান প্রদেশেই

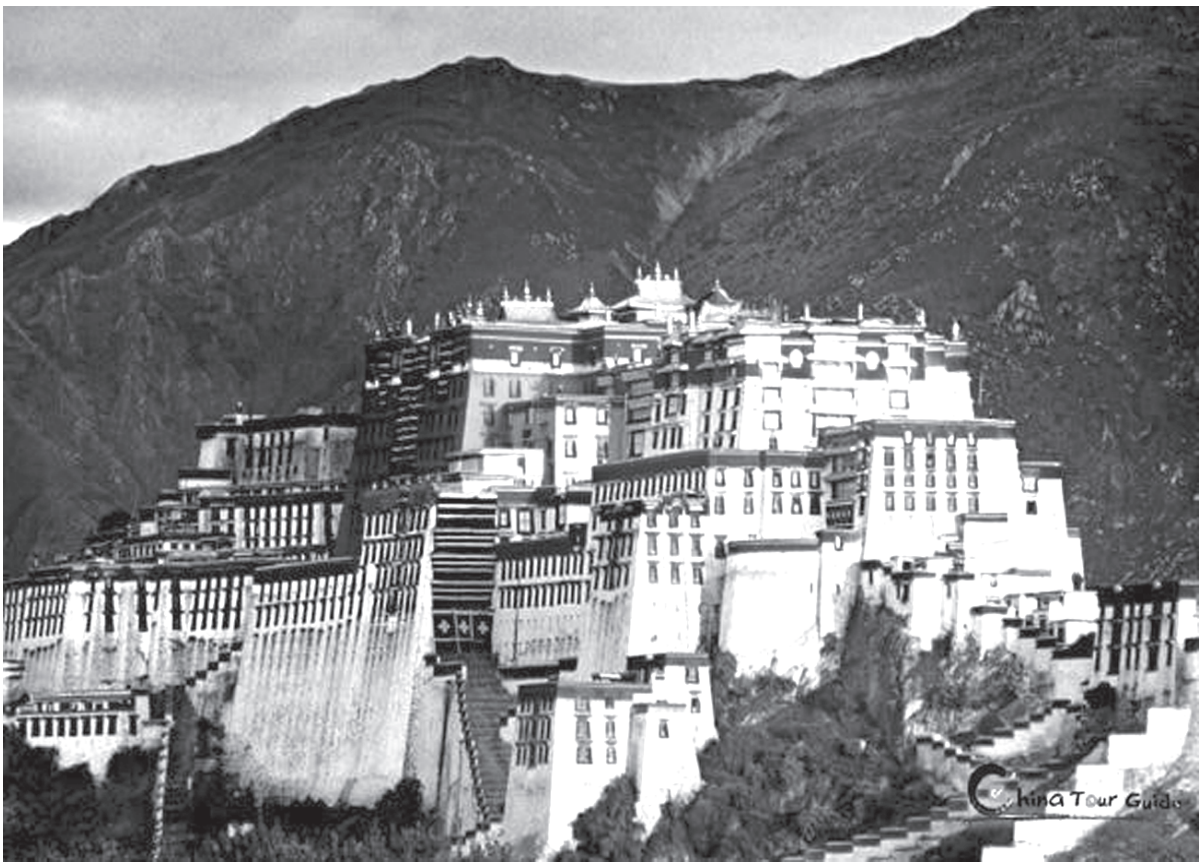

পোটালা প্যালেস

২৮টি সংস্থা তাদের শিল্পোৎপাদন ও উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য দ্বিগুণ দেখিয়েছে। লুলিয়াং অঞ্চলের সরকারি আধিকারিকদের চাপেই নাকি এমনটি ঘটেছে। এটিকে হিমশৈলের চূড়া ভাবা হচ্ছে, কারণ এই ব্যুরো সারা দেশে সাত লক্ষ প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন ও সমীক্ষায় নিযুক্ত যেগুলি দেশের জি.ডি.পি.-র ৮০ শতাংশ জোগান দেয়। উঁচু হারে ডিউটি ছাড় পাওয়ার জন্যই এমনটি করা হয়।

অনেক কারণের মধ্যে কেবল দুর্নীতির জন্য বেআইনি পথে মূলধনের দেশছাড়া হওয়ার পরিমাণ প্রায় সে দেশের জাতীয় আয়ের দশ শতাংশ ভাবা হয়। World Forum for alternatives জানাচ্ছে কেবল ২০০০ সালেই মূলধনের দেশছাড়া হওয়ার পরিমাণ ছিল ৪৮ বিলিয়ন ডলার। এই সংখ্যাটা সে বছরের ৪০.৭ বিলিয়ন ডলার প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের চেয়েও বেশি। এই দিক দিয়ে চীন ভেনিজুয়েলা, মেক্সিকো ও অর্জেন্টিনার মতো চঞ্চলা লক্ষ্মীর দেশগুলির সঙ্গে তুলনীয়। লক্ষ লক্ষ কর্মচ্যুত কর্মীকে লে অফ বা স্বেচ্ছাবসর বলে ওখানে দেখানো হচ্ছে। ওয়ার্লড ফোরাম জানাচ্ছে ছদ্মবেকারত্ব আজকের চীনে ২৮ শতাংশ।

চঞ্চুসেবী চীন আজ অতীত। বর্তমানে সে দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বয়স কুড়ির কম। তিয়েন আন মেনে মাও মেমোরিয়ালের সিঁড়িতে সেল্ফিতে ছবি তোলায় মনোযোগী অল্পবয়সী ছেলে মেয়েটি ১৯৮৯ এর তিয়েন আন মেনের খবর রাখে না। এদের তখন জন্মই হয়নি। কানে গোঁজা কর্ড অ্যান্ডরয়েড প্রজন্মের ব্যাঙ্গালোর বা বেজিং হয় না। দুনিয়া জোড়া কে.এফ.সি. চিকেনের মত এরা বর্ণে-গন্ধে-স্বাদে-সমান। আজকের চীনা নেতৃত্ব তাই বার্ধক্যের এ্যান্টিকে আচ্ছন্ন থাকতে রাজি নয়।

আজকের চীনা নেতৃত্বকে নতুন যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তা হল একদলীয় স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে পুষ্টিপ্রাপ্ত নতুন বিত্তবানদের সঙ্গে বিশাল সংখ্যক বেকার তরুণ প্রজন্মের শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্ব। সব সমাজেই সব ব্যবস্থায় কিছু সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। অতীতে সোভিয়েত ইউনিয়নেও এমনটা ঘটতে দেখা গেছে। সেখানে ২৮৬ মিলিয়নের মধ্যে ৯৭ মিলিয়ন লোকের হাতে ছিল ১০ হাজার বিলিয়ন ডলার সম্পত্তি। আজকের চীনে তেমনটি ঘটতে চলেছে। স্বাধীন সংবাদমাধ্যমের অনুপস্থিতির জন্য চীনে দুর্নীতি প্রকাশের ছিদ্রপথ বন্ধ। এমন কথা বলা হয়। কথাটা সবটা অসত্য না হলেও কিছু কিছু তথ্য খবরের কাগজেই ইদানীং প্রকাশ পাচ্ছে। আমাদের অবস্থান কালেই চায়না ডেইলিতে পড়লাম সাতজন নামী অধ্যাপক ও বিজ্ঞানীকে সরকারি কোষাগারের চার মিলিয়ন ডলার তছরুপের দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনায় চিঠিপত্র কলমে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে ছাত্র থেকে সমাজের নানা স্তরের মানুষ।

লি নিঙয়ের মতো বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর এই দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার ঘটনাকে উদ্ধৃত করে কাগজ লিখছে এটি দুর্নীতির হিমশৈল মাত্র। শিক্ষা দপ্তরের অ্যাকাডেমিক মরালিটি কমিটির সভ্য অধ্যাপক ইয়াঙ উ শেঙ বলেছেন, চীনে একশ বছরে একজনও বিজ্ঞানীর নোবেল পুরস্কার না পাওয়ার কারণই হল দুর্নীতি।

এটা পরিষ্কার যে চীনের বর্তমান প্রশাসন বুঝেছে আজকের চীনের ইউয়ান কোটিপতিরা কোন অবস্থাতেই কমিউনিস্ট স্বৈরতন্ত্র মানবে না। একদিকে ছাত্রশক্তি অন্যদিকে খামার শিল্প শক্তিকে এক সঙ্গে সামাল দিতে হলেও যে অস্বস্তিকর দমন-পীড়ন চালানো দরকার তা হজম করার শক্তি চীনের জনগণের কতটা আছে তার ওপর নির্ভর করবে চীনের ভবিষ্যৎ। 'চীনকে জাগিও না, সে জাগলে পশ্চিমের বিপদ' এই উক্তি কতটা সত্যি হয় সেটাই দেখার।

ঘরে ফেরার পথে কুনমিং বিমান বন্দরের লাউঞ্জে বসে মনে হল চীন ভ্রমণ আমাদের সমে এসে থামলো ঠিকই কিন্তু চীন দর্শন হল কী? সমগ্র গুপ্তযুগ ধরে বৌদ্ধধর্ম যখন সুনামির মতো এশিয়ার দেশে দেশে আছড়ে পড়েছিল তখন চীনা সম্রাটদের মধ্যে ভারত তথা সংস্কৃত চর্চার ইচ্ছা প্রবল আকার ধারণ করেছিল। চীনের বৌদ্ধিক বিকাশে দক্ষিণ ভারত থেকে যাওয়া বোধিধর্ম ও কাশ্মীরি পণ্ডিত কুমারজীবকে আজও ধর্মপ্রাণ চীনারা ঈশ্বরের আসনে বসান। দস্যু, তস্কর, প্রতিকূল আবহাওয়া, ভাষা, পথশ্রম সব কিছুকে যদি দু'দেশের মহাজনেরা সেদিন জয় করতে পারে একবিংশ শতকের মানুষজন পারবে না কেন?

আমরা কজন খবর রাখি মহাপ্রাচীরের ক্লাউড টেরাস অংশে কবে কোন হাজার বছর আগে চীনারা তিব্বতী, মোঙ্গল, বাসিবা, উইঘুরো, চীনা-ই-সিসিয়া ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষাতেও খোদাই করে রেখেছে বুদ্ধের বাণী। আবার যদি কোনোদিন চীন ভ্রমণের সুযোগ আসে ইচ্ছে রইলো অন্তত কাজ চালানোর মত মেন্ডারিন ভাষাটা শিখে সে দেশে যাব।

দেশান্তর

গোপাল চক্রবর্তী

চট্টল সমিতির শনি-কালী মন্দিরের পাশেই তৈরি হয়েছে একটা অস্থায়ী চালা। এখানে এবার ঠাকুর তৈরি হবে। অন্যান্যবার বারাসাত থেকে তৈরি ঠাকুর নিয়ে আসা হত, তাতে অনেক ঝামেলা। পছন্দ হয় না, সেবার লরি থেকে নামাতে গিয়ে গণেশের শুঁড়টাই ভেঙে গেল। অপর্ণা মধু ঘোষদের বাড়ি থেকে এক বালতি গোবর এনে জায়গাটা নিকিয়েছে। রাতুল আর প্রতাপকে দিয়ে একটা বাঁশ বাঁধিয়েছে। বাচ্চাদের সাবধান করেছে, বাঁশ টপকে কেউ যেন ঠাকুর গড়ার জায়গায় পা না দেয়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গা থানার এই অঞ্চলে মূলত পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের বাস। বেশিরভাগই চট্টগ্রাম জেলার লোক। এরা দেশভাগের পর আসেনি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সাময়িক ভাবে শরণার্থী হয়ে অনেকে এপারে এলেও দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবার মাতৃভূমির টানে ফিরে গিয়েছিল। যারা যায়নি তারা এই অঞ্চলে সস্তায় জমি কিনে ঘরবাড়ি বানিয়েছিল। তখন এই অঞ্চলটা ছিল ফাঁকা। খানিকটা দূরে মুসলমানদের গ্রাম। মুসলমানদের কবরস্থানের কাছাকাছি অনেকটা জমি পড়েছিল, ওই জমির মালিক কে তা কেউ জানে না। এই সময় ওপার থেকে দলে দলে লোক বাধ্য হয়ে চলে এলো এপারে, এই অঞ্চলে। অনেকে জমি কিনে ঘরবাড়ি করে মিশে গেল স্থানীয়দের সঙ্গে। অপর্ণারাও সেই স্রোতে এই দেগঙ্গায় এসেছে। অপর্ণার মামারা অনেক আগে এখানে এসেছে, প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অপর্ণার বাবা

সন্দীপ চৌধুরী চট্টগ্রাম রেলে কাজ করত, ওয়ার্কশপের ফোরম্যান। পটিয়ায় বাড়ি, জমি, বাগান, পুকুর জমজমাট সংসার। ওসব অঞ্চলে হিন্দুপাড়ায় যাত্রা-থিয়েটারের খুব চল, সন্দীপ চৌধুরী যাত্রা থিয়েটারের ভাল অভিনেতা। সুদর্শন সন্দীপ চৌধুরীর তখন পটিয়া, ধলঘাট, কানুনগোপাড়া, হাওলা, কধুরঘীল এসব জায়গায় অভিনেতা হিসাবে বিরাট সুনাম। তখনও ওসব জায়গার লোকেরা সারা রাত জেগে যাত্রা থিয়েটার দেখতো। অপর্ণার মনে পড়ে সেসব সুন্দর দিনগুলোর কথা। সন্দীপবাবু চাকরিতে থাকতেই দিদি সুপর্ণার বিয়ে হয়ে যায়। অপর্ণা পটিয়া স্কুল থেকে স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাশ করে পটিয়া কলেজে ভর্তি হয়। অপর্ণা ভাল আবৃত্তি করতে পারত। গান করতে পারত। দুর্গাপুজো, বাসন্তীপুজো ছাড়া ২৫শে বৈশাখ, ১১ই জ্যৈষ্ঠ আর ২১শে ফেব্রুয়ারি এই তিনটি দিন ছিল অপর্ণার ভারী প্রিয়। অপর্ণাদের বাড়ির পাশেই হতো পাড়ার বারোয়ারি পুজো। ঠাকুর গড়া হতো ওদের বারান্দায়, ফরিদপুরের রাধেশ্যাম পাল আসতো ঠাকুর গড়তে। ঠাকুর গড়ার দিনগুলিতে অপর্ণার উপর থাকত ওদের দেখাশোনার দায়িত্ব। বেশ সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো। হঠাৎ একটা আঘাতে সব চুরমার হয়ে গেল। বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন। একদিকে শেখ হাসিনার আওয়ামি লীগ অন্যদিকে খালেদা জিয়ার বি এন পি, তার জোটসঙ্গী জামাতে ইসলাম আর তাদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তি। ওরা সেবারে নানা বাহানা করে নির্বাচন বয়কট করেছে। হিন্দু ভোটারদের উপর ফতোয়া জারি করেছে তারা যেন ভোট দিতে না যায়। গেলে ফল হবে মারাত্মক। বাংলাদেশের হিন্দু ভোটাররা আওয়ামি লীগের জন্মলগ্ন সেই পাকিস্তান আমল থেকেই আওয়ামি লীগের সমর্থক। অন্যসব দল জানে হিন্দুদের ভোট আওয়ামি লীগের বাক্সেই পড়বে। জামাতে ইসলামি-সহ মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দলগুলি তখন অতি সক্রিয়। আওয়ামি লীগকে যে কোনো মূল্যে আটকাতে হবে। সেবার ভোটে এরশাদের জাতীয় পার্টি এবং আরও কয়েকটা ছোট ছোট প্রগতিশীল দলও ভোটে অংশ নিল। কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে ভোট হতে হবে— এই গোঁ ধরে বি এন পি-জামাত জোট ভোটে অংশ নিল না। কিন্তু ভোট হলো নির্দিষ্ট দিনে। আর ফলাফলে আওয়ামি লীগের জয়-জয়কার। কিন্তু এই জয়ের আনন্দে মেতে উঠতে পারলো না হিন্দুরা। তার আগে তারা শিকার হলো বি এন পি-জামাতের নিষ্ঠুর আক্রমণের। ঠিক যেন ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ের পুনরাবৃত্তি। ওরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে হিন্দু গ্রামগুলো উপর পৈশাচিক আক্রমণ করল, ধ্বংস করল মন্দির, ঘরবাড়ি, সোনার সংসার, ইজ্জত গেল মেয়েদের। অপর্ণার আজও মনে আছে সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলোর কথা—

পুরো অঞ্চলের পরিস্থিতি থমথমে। সন্দীপবাবু সেদিন বিকেলের মধ্যে অফিস থেকে চলে এসেছেন। থমথমে মুখ, এসে বললেন— পরিস্থিতি ভাল নয়। ডেঙ্গাপাড়ার মসজিদে প্রচুর বাইরের লোক এসেছে। আমীর আলির সঙ্গে দেখা হলো। বলল, সাবধানে থাকতে। কি যে হবে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। খুকুটা আবার গেল কোথায়?

— এই যে বাবা, আমি এখানে। অপর্ণা পাশের ঘর থেকে সাড়া দেয়।

— শোন মা, আজ আর বাড়ির বাইরে যাসনে। আর দরজায় একদম তালা লাগিয়ে দে।

অপর্ণার মা চুপি চুপি বলে— শোনো, আজ দুপুরে রতনদাদা এসেছিল, বলল আজ থেকে পাড়ায় রাত পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে, তোমাকেও থাকতে হবে।

— তার মানে ব্যাপারটা সবাই জানে।

শেষপর্যন্ত কথা হয়েছিল প্রত্যেক বাড়ির থেকে একজন করে পুরুষ রাত ন'টার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে দুর্গাবাড়ির মাঠে জমায়েত হবে। তারপর সারা রাত জেগে পাড়া পাহারা দেবে। কিন্তু সেই সুযোগ আর তারা পায়নি। সন্ধে হতে না হতেই একদল সশস্ত্র জনতা হিন্দু অধ্যুষিত নবগ্রাম, চক্রশালা, গুয়াতলী গ্রামের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লুঠতরাজ, অগ্নি সংযোগ, মেয়েদের উপর অত্যাচার কিছুই বাদ দেয়নি। সন্দীপবাবু সবে হাতমুখ ধুয়ে একমুঠো মুড়ি মুখে দিয়েছেন, এমন সময় দরজা ঠেলে হৈহৈ করে দশ পনেরো জনের একটি দল ঢুকে পড়ে বাড়ির ভেতর, সন্দীরবাবু চিৎকার করে ওঠেন— কে তোমরা, কি চাও?

একজন একটা লম্বা ছুরি বাগিয়ে ধরে সন্দীপবাবুর দিকে, বলে— এই চুপ শালা, কথা বললে একদম শেষ করে দেব। এই যে, এই শালা মালদার। ঘরবাড়ি ফাঁকা করে দে। মুহূর্তের মধ্যে শুরু হয়ে গেল লুঠপাট।

সন্দীপবাবু চেনেন ওদের কয়েকজনকে। একজন আবু রাজাকারের ছেলে ওবায়দুল, একজন হাটে দর্জির কাজ করে, কলেজে পড়া ছাত্রও আছে ক'জন, বাকিরা অচেনা। ঘরের দামি দামি জিনিসপত্রগুলি ওরা চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এমনকী সন্দীপবাবুর সাইকেলটা অবধি। অপর্ণা ঘরের দরজা দিয়েছিল। একজন বলল— এই মেয়েটা, কোথায় রে?

আরেকজন বলল— ওই বন্ধ ঘরটায় দেখতো।

গায়ে ওদের অসীম শক্তি, কয়েকটা ধাক্কা দিতেই দরজা গেল ভেঙে। অপর্ণা ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

— নাঃ।

পাশ থেকে শ্যামলী বাবলু বলে উঠল— কিরে অপুদি, চিৎকার করে উঠলি কেন?

অপর্ণা সম্বিত ফিরে পায়, লজ্জাও পায়।

— তুই কি ভয় পেয়েছিস?

— না, ও কিছু না।

বাবলু বলল— কিছু না মানে! তুই এমন জোরে চিৎকার করলি, আমরাই তো ভয় পেয়ে গেছি। দিনেরবেলায় স্বপ্ন দেখছিলি নাকি?

অপর্ণা প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার জন্য বলে— শোন না বাবলু, রাতুলদের বললাম এখানে একটা বাঁশ বেঁধে দে। দেখ, কুকুর-টুকুর ঢুকে যাবে না বল? তুই নগেনকাকাদের বাড়ি থেকে আর একটা বাঁশ এনে একটু উঁচু করে বেঁধে দে-না ভাই।

— আচ্ছা দিচ্ছি, চলতো শ্যামলী।

ওরা চলে গেল। অপর্ণা সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলোকে স্মরণ করতে চায় না। তবুও সেই স্মৃতি ফিরে ফিরে আসে। ওরা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতেই মা অপরাজিতা অপর্ণাকে জড়িয়ে ধরে। সন্দীপবাবু গর্জন করে ওঠেন— খবরদার মেয়েদের গায়ে হাত দেবে না।

এগিয়ে আসে আবু রাজাকারের ছেলে ওবায়দুল। সন্দীপবাবুর বুকের কাছে পিস্তল ধরে বলে— এই শালা, তখন বাড়ি এসে বলেছিলাম, ভোট দিতে যাবি না। শুনেছিলি?

— ভোট দেওয়া আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার।

— এই শালা কাফেরের বাচ্ছা, ওইসব গণতন্ত্র ইন্ডিয়ায় গিয়ে দেখাবি। বাংলাদেশে আমাদের কথাই গণতন্ত্র। তোদের জন্য শালা আজ পাকিস্তান ভেঙেছে। ভেবেছিস আওয়ামি লীগ তোদের বাঁচাবে? দেখ শালা কে বাঁচায় তোদের। এই মেয়েটাকে নিয়ে চল।

— না, খবরদার আমার মেয়ের গায়ে হাত দিবি না।

সন্দীপ সর্বশক্তি দিয়ে ধাক্কা মারেন ওবায়দুল্লাকে। ছিটকে পড়ে সে। অপর্ণাকে তখন কয়েকজন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। সন্দীপ ঝাঁপিয়ে পড়েন তাদের ওপর। ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে সন্দীপকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় ওবায়দুল। আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সন্দীপবাবু। অপর্ণা সর্বশক্তি দিয়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু এতজনের সঙ্গে সে পারবে কেন? ঠিক এই সময় সাইরেন বাজিয়ে পুলিশের গাড়ি ঢোকে পাড়ায়। কেউ একজন ছুটে এসে খবর দেয়— পুলিশ এসে গেছে।

ওরা ছুটে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। যাবার সময় বলে যায়— আমরা আবার আসব।

সেদিন সেই পুলিশের গাড়িতে সন্দীপবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আঘাত মারাত্মক নয়, গুলিটা ডান হাতে লেগেছিল। তবুও কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল সন্দীপবাবুকে। ছাড়া পেয়ে যখন বাড়ি আসেন তখন পাড়ায় পুলিশ পিকেট বসেছে। তাই কিছুটা নিশ্চিন্ত, পাড়ার অনেকের সঙ্গে সন্দীপবাবুও পুলিশকে সব জানিয়ে মামলা করেছিলেন। যাদের যাদের সন্দীপবাবু চেনেন তাদের নামে মামলা হয়েছে। গ্রেপ্তারও হয়েছিল ক'জন। কিন্তু ক'দিনের মধ্যে ওরা জামিন পেয়ে বহাল তবিয়তে ঘুরতে লাগল। এদিকে পুলিশ পিকেট উঠে যেতেই ওরা আবার হুমকি দেওয়া শুরু করল। সব মামলা তুলে নিতে হবে, নইলে জানে খতম। শুধু তাই নয়, প্রস্তাব এলো, এদেশে থাকতে হলে আবু রাজাকারের ছেলের সঙ্গে অপর্ণার বিয়ে দিতে হবে। বমি আসে অপর্ণার, গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বেরিয়ে আসে। আশপাশে যারা ছিল তারা সচকিত হয়। রায়দাদু বলেন—

— কি হলো রে অপু?

অপর্ণা বলে— ও কিছু না দাদু।

বাবলু আর শ্যামলী বাঁশ নিয়ে আসে। বাবলু বলে— জেঠিমা তোমাকে ডাকছে অপুদি, বাড়ি যাও।

— হ্যাঁ যাচ্ছি, তোরা বাঁশটা একটু উঁচু করে বেঁধে দে।

অপর্ণা বাড়ির পথে পা বাড়াল। মন্ডপ থেকে সাত-আটটা বাড়ির পরেই অপর্ণাদের বাড়ি। আড়াই কাঠা জমির ওপর একতলা, টালির ছাউনি দুটো ঘর, রান্নাঘর, বারান্দা। একপাশে

পায়খানা বাথরুম, কলতলা। বাড়ির সামনে তুলসীমঞ্চ। ঘরে ঢুকতে মা বলেন— এত দেরি করলি খুকু? তোর বাবা সেই কখন থেকে বসে আছে একসঙ্গে খাবে বলে।

— এই তো যাচ্ছি মা, তুমি ভাত বাড়তে থাকো।

অপর্ণা শাড়ি গামছা নিয়ে বাথরুমে ঢোকে। একদিন সারা শরীরে কতগুলো নোংরা লোকের স্পর্শ লেগেছিল, তাই রোজ সুগন্ধি সাবান দিয়ে শরীরটাকে ধুয়ে ধুয়ে পবিত্র করার চেষ্টা করে অপর্ণা। তবুও সেই দুর্গন্ধ নাকে লেগে থাকে। নিজেকে অপবিত্র মনে হয়। সন্দীপবাবুর আরও দু-বছর চাকরি ছিল। বাড়ি পুকুর বাগান জমি গোরুবাছুর সব আমীর আলির হাতে দিয়ে মাত্র কয়েক হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে পরিবার পরিজন-সহ অজানার পথে পা বাড়িয়েছিলেন সন্দীপবাবু। আমীর আলি ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গে স্কুলে কলেজে পড়েছে। রাজনীতি করেছে। যাত্রা থিয়েটার করেছে। আমীর আলি গ্রামের হাইস্কুলে চাকরি পেল আর সন্দীপ রেলে। বন্ধুত্ব দু'জনের অটুট। সেই বিপদের দিনে আমীর আলি পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। পার্টি, থানা-পুলিশ সর্বত্র সন্দীপকে নিয়ে ছুটেছে। থানার বড় মিঞা (অফিসার ইনচার্জ) আমতা আমতা করে বলল, আমরা আপনাদের ক'দিন প্রোটেকশান দেবো বলুন! আপনারা বরং ওদের সঙ্গে একটা রফা করে ফেলুন। গর্জে উঠেছিল সন্দীপ। আমীরকে নিয়ে আওয়ামি লীগের ওপর মহলেও যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। বিজয়ী দল, শপথগ্রহণ, মন্ত্রীসভা গঠন, অনেক বড় বড় কাজ, এসব ছোটখাট ব্যাপারকে কেউ গুরুত্ব দিতে রাজি হয়নি। আমীরও হাল ছেড়ে দিয়েছিল।

— কিরে খুকু তুই আর কত দেরি করবি?

মায়ের তাড়ায় তাড়াতাড়ি স্নান সেরে বেরিয়ে আসে অপর্ণা। মা ততক্ষণে দুটো আসন আর দু-গ্লাস জল ঢেলে দিয়েছেন।

— বাবা খাবে এসো।

সন্দীপবাবু এসে বসলেন মেয়ের পাশে। — কতটা হলো তোদের কাজ?

— ওই চালাটা হয়েছে ভিতরটা গোবর দিয়ে এলাম। মা, মোচাটা খুব ভাল হয়েছে।

— আর একটু দেবো?

— তোমার জন্য থাকবে তো?

— হ্যাঁ রে, অনেকটা করেছি।

অপরাজিতা এক হাতা করে মোচার ঘণ্ট বাপ মেয়ের পাতে তুলে দেয়।

— আমাকে আবার দিতে গেলে কেন? ওকে দাও।

— বাবা।

— বলো।

— আচ্ছা, পুজোর সময় একটা নাটক করলে হয় না! পাড়ার ছেলে মেয়েদের নিয়ে। আমাদের দেশে যেমন হতো।

— কে করবে ওসব ঝামেলা?

— কেন তুমি করবে, অনেকদিন তো নাটক করোনি। বাবা তোমার ইচ্ছে করে না?

সন্দীপবাবু কোনো জবাব দেন না।

— বলো না বাবা করবে তো?

— দেখ, নাটক করতে গেলে অনেক খরচ। আর আমার সময় কোথায়?

— খরচের কথা ভেবো না, লাইট মাইক তো থাকবেই, আরেকটু বাড়িয়ে নিলেই হবে। আর তুমি দোকান থেকে এসে রাতে রিহার্সেল করাবে। আমি কিন্তু সবাইকে বলে দিচ্ছি।

সেই দিনই পাড়ায় প্রচার হয়ে গেল এবার পুজোর বাড়তি আকর্ষণ নাটক। পাড়ায় যাদের বাস তারা সবাই ওপার বাংলায় যাত্রা থিয়েটার করেছে, দেখেছে। তাই ভালই সাড়া পাওয়া গেল। পাড়ায় বিজয় দত্ত কলেজ স্ট্রিটে বইয়ের দোকানে কাজ করে। তাকে দিয়ে নবগ্রন্থ কুটির থেকে নাটকের কয়েকটা বইও আনিয়ে নিলেন সন্দীপবাবু। মোটামুটি একটা নাটক পছন্দও হলো। সেদিন রায়বাবু এসে ধরলেন সন্দীপকে, বললেন— সন্দীপবাবু থিয়েটার করাচ্ছেন শুনলাম। আমাকে কিন্তু একটা পার্ট দেবেন। একসময় অনেক করেছি বুঝলেন— যাত্রা থিয়েটার....'

— হ্যাঁ, নিশ্চয় করবেন। তবে রিহার্সেল হবে তো রাতে, আপনার অসুবিধা হবে না তো?

— না, না। আমার তো রাত বারোটা-একটার আগে ঘুমই আসে না।

পাড়ার ছেলেমেয়েদের অনেকে নাটকে পার্ট করতে আগ্রহী। তাদের সংখ্যাও প্রায় চল্লিশ জন, সবাইকে নিতে হবে। কিন্তু অত চরিত্রের নাটক কোথায়? অগত্যা সন্দীপবাবুকে নাটক লিখতে হলো। রিহার্সেল চলছে পুরোদমে। ছোটবড় মিলে পঁয়তাল্লিশটা চরিত্র। অপর্ণার মা মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়, বলে— বাপ মেয়ে দুটোই পাগল, দোকানটা চলছিল ভালো। এই নাটকের তালে না এবার লাটে ওঠে।

অপর্ণা বলে— অমন করে বলছো কেন মা? এই তো মাত্র কটা দিন। পাড়ার ছেলেমেয়েরা কত আনন্দ পাচ্ছে বলো! আর বাবাকে দেখো, বয়স কমে যেন পঁচিশ বছর হয়ে গেছে।

— এই মার খাবি কিন্তু। আমাকে হাতে-পায়ে ধরে নামিয়ে এখন মজা করা হচ্ছে, না?

— সত্যি করে বলো তো বাবা, এই নাটকে নেমে তুমি খুশি হয়েছো তো?

সন্দীপবাবু কোনো কথা বলেন না। তাঁর চোখ দিয়ে শুধু দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। এসব যাত্রা নাটক ছেড়েছেন আজ কত বছর হয়ে গেল। এদেশে অনেকবার ঘুরে গেলেও পাকাপাকি চলে আসার কথা কোনোদিনও ভাবেননি সন্দীপবাবু। আঘাত যে আসেনি তা নয়। সংখ্যালঘু হিন্দু বলে নানাভাবে হেনস্থা হতে হয়েছে। কিন্তু পাশে দাঁড়াবার লোকও কম ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে পরিস্থিতি পাল্টাতে লাগল। কিছু বহিরাগত, স্থানীয় মুসলমানদের সঙ্গে মিশে গিয়ে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। তাদের প্রচুর অর্থ, প্রগতির বিরুদ্ধে তাদের জেহাদ, ধর্মের নামে উন্মত্ত, হিংস্র। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তিকে ওরা জোটবদ্ধ করতে পেরেছে। ওদের পরিকল্পিত সন্ত্রাস ঠেকাতে প্রশাসন নাজেহাল। সন্দীপবাবু মনস্থির করেছিলেন আর নয়, এবার মাতৃভূমির মায়া কাটাতে হবে। আমীরকে বললেন, আমার সব তুই রাখ, যা পারিস টাকা আমায় জোগাড় করে দে। তারপর বলতে গেলে আমীরই সব করেছে, পাসপোর্ট, ভিসা, ডলার কেনা, সব। চট্টগ্রাম শহরে এসে দুদিন থেকে একরাতে ঢাকার বাসে তুলে দিল আমীর। কিছু টাকা থাকল আমীরের কাছে, এদেশে পৌঁছে থিতু হলে হুন্ডি করে পাটিয়ে দেবে। এদেশে এসে এক আত্মীয়ের বাড়িতে কিছুদিন থেকেছিল, সেই আত্মীয়ই এখানে জমি দেখে দিয়েছিলেন। বলতে গেলে সস্তায় পাওয়া গেছে জমিটা। দেগঙ্গা বাজারে একটা দোকানঘরও পাওয়া গেল। তারপর শুরু হল এই জীবন। অপর্ণাকে আবার স্কুলে ক্লাস নাইনে ভর্তি হতে হলো। তারপর সব পরীক্ষায় ভাল ফল করেছে। আমীরও যথা সময়ে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে।

— কি গো তুমি আজকে দোকান-টোকান যাবে না নাকি?

অপরাজিতার কথায় সেই চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে যায় সন্দীপের। বলে— ও মা! এত দেরি হয়ে গেল, বলবে তো। খুকু আমার চশমাটা দে, আর ওদের বলে দিস রাত ন'টার পর যেন সবাই খাওয়া-দাওয়া করে আসে।

সন্দীপবাবু দোকানে চলে গেলেন। সেদিন বিকেলে জনা তিরিশেক লোক এল মুসলমান পাড়া থেকে। সবার মাথায় টুপি। তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে আগে কখনো এই এলাকায় দেখা যায়নি। তাদের লম্বা পাঞ্জাবি, খাটো পাজামা, থুতনিতে দাড়ি চোখে মুখে হিংস্রতা। পাড়ার লোকেরা ভেবেছিল ওরা হয়তো কোনো মৃতকে কবর দিতে এসেছে। কিন্তু মৃতদেহ কোথায়? কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে ওরা সবাই শনিকালী মন্দিরের চাতালে বসে পড়ল। তখন পাড়ার লোকেরা এগিয়ে গেল। রায়বাবু তাদের মধ্যে বয়স্ক, তিনি বললেন— কি চাই বাপু তোমাদের এখানে?

— শোনা, আমাদের পবিত্র কবরস্থানের পাশে তোমাদের এই মন্দির রাখা চলবে না। আর তোমাদের ওসব পুজো-টুজোও এখানে হবে না।— ওদের একজন বলল।

রায়বাবু বললেন— কি বলছো তোমরা, এখানে পুজো হবে না? এত বছর ধরে আমরা পুজো করছি। এ তোমাদের কথায় বন্ধ করবো?

— হ্যাঁ করবে। এ জায়গা আমাদের কবরস্থানের, এই জায়গা আমরা অপবিত্র করতে দেব না।

রাতুল কলেজে পড়ে, একটু রগচটা ধরনের। সে বলল— এখানে মন্দির থাকবে কি থাকবে না, আমরা পুজো করবো কি করবো না, সে বিধান দেওয়ার তোমরা কে? এখানে পুজো হচ্ছে, হবে।

একজন ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল— এ কবরস্থান হ্যায়, ইধার পূজা নেহী হোগা।

— কবরস্থান, কবরস্থানের জায়গায় থাকবে। আমরা তো ওখানে পুজো করতে যাচ্ছি না। আমাদের মন্দিরও তো অনেক দিনের। এতদিন তো এসব কথা আসেনি। আজ আসছে কেন?

—এখন পরিস্থিতি পাল্টে যাচ্ছে, এখন আমরা যা বলবো তাই শুনতে হবে।

ততক্ষণে কলোনির লোকজন জমে গেছে। অপর্ণাও চেঁচামেচি শুনে চলে এসেছিল। তার মনে হলো এরা তার সেই পরিচিত বাংলাদেশের ওয়াবদুলের দল। এদের চলন বলন, চোখের চাহনি সব এক। ওদের দেখে অপর্ণার মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। ওদের দিকে আঙুল উঁচিয়ে দীপ্ত কণ্ঠে বলল অপর্ণা— এই শোনো, পুজো আমরা করবো। আর এখানেই করবো। তোমরা এখন যাও এখান থেকে। আর দাঁড়িয়ে থেকো না।

অপর্ণাকে যারা চেনে তারা তার এই মূর্তি কখনো দেখেনি। সেই রণরঙ্গিণী, ওরাও হয়তো ভয় পেয়েছিল, তবুও একজন সাহস করে এগিয়ে এলো— এই-ই....

ওদের আর একজন তার হাত ধরে কিছু ইশারা করল। নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করে চলে গেল ওরা। রায়বাবু এসে অপর্ণার হাত ধরে বললেন— আজ জীবন্ত দুর্গা দেখলাম।

এই কলোনিতে যারা পাকিস্তানের সময় এসেছে পুজোপাঠ, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাধা পাওয়ার অভিজ্ঞতা তাদের আছে। যারা বাংলাদেশ হওয়ার পরে এসেছে তাদের অভিজ্ঞতাও কম নয়। কিন্তু ভারতের মাটিতে পুজো করতে গিয়ে এমন হুমকির মুখে পড়তে হবে তা হয়তো কলোনির মানুষেরা কল্পনাও করতে পারেনি। সবাই ভাবলো ব্যাপারটা হয়তো মিটে গেল। কিন্তু ভুল ভাঙলো সেদিন সন্ধ্যার পর। মায়েরা তখন রান্না ঘরে, পুজোর আগে হাফইয়ারলি, বাচ্চারা পড়াশুনায় মন দিয়েছে। বয়স্করা শনিকালী মন্দিরের চাতালে বসে গল্পগুজব করে অনেক রাত অবধি, বাড়ি থেকে খাওয়ার ডাক এলে যে যার বাড়িতে চলে যায়। সেদিনও বয়স্কদের আসর জমে উঠেছে আলোচ্য বিষয় বিকেলের ঘটনা। অসিত নাগ বলল— সেই '৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হল ৬ সেপ্টেম্বর। তার ক'দিন পরেই দুর্গা পুজো, কয়েকজন বলল— এই পরিস্থিতিতে এবছর পুজো বন্ধ থাক। আমরা বললাম না, পুজো হবে। আড়ম্বর দরকার নেই, তবে পুজো বন্ধ হবে না। পুজো হলো।

বরদা পণ্ডিত বললেন— জানো তো '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়, অষ্টমীর দিন আমাদের গ্রামে মিলিটারি ঢুকলো। সবাই ভয়ে পালিয়ে গেলেও আমি পুজোর আসন থেকে উঠিনি। পুজোর কাজকর্ম করতো অম্বিকা, সে একটা পাঁঠা বলির খাঁড়া নিয়ে দরজায় দাঁড়াল, তার সে কি ভয়ঙ্কর মূর্তি। বলল— পণ্ডিত মশাই যদি কেউ মণ্ডপে ঢোকে তাকে মায়ের কাছে বলি দেব।

আমাদের মণ্ডপে সেদিন কিছু হয়নি, তবে পুজো শেষ করে যখন বেরুলাম, শুনলাম আমাদের গ্রাম থেকেই ১২ জন নিরীহ মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাশের খালের পাড়ে গুলি করে মেরেছে ওরা।

ততক্ষণে বরদা পণ্ডিত নাতি এসে বলল— দাদু, মা খেতে ডাকছে।

— চলো দাদু, চলিরে, ঠাকুর বাঁচিয়ে রাখলে কাল দেখা হবে।

রায়বাবু বললেন— আমিও উঠি, ওষুধ খাওয়ার সময় হলো। দেখি, খেয়েদেয়ে একবার ওদের নাটকের মহড়ায় আসবো।

রায়বাবুর মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। লাঠিসোটা, তলোয়ার হাতে অসংখ্য মানুষ ঢুকে পড়ল মন্দির চত্বরে। কিছু বোঝার আগেই কয়েকজন মন্দিরের বিগ্রহগুলোকে টেনে হিঁচড়ে চত্বরে ফেলে দিল। কয়েকজন পা দিয়ে ভাঙল মূর্তিগুলো। একজন লুঙ্গি তুলে প্রস্রাব করল মূর্তি উপর। রায়বাবু বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে চিৎকার করে বললেন— কে তোমরা? কি করছো এসব?

ওদের একজন এগিয়ে এলো রায়বাবুর দিকে, প্রচণ্ড একটা ধাক্কা দিয়ে বলল— তোর বাপ আছিরে শালা।

ছিটকে পড়লেন রায়বাবু। অন্য যারা ছিল তারা রায়বাবুকে তোলার চেষ্টা করলেন। ততক্ষণে কলোনির লোক সব বেরিয়ে এসেছে। সবাই মিলে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করল। কিন্তু সংখ্যা অনেক বেশি ওদের, এই পরিকল্পিত হামলার মোকাবিলা করতে গিয়ে কলোনির লোকেরা মুখ থুবড়ে পড়ল। কয়েকজন পুলিশে ফোন করল। থানায় দৌড়ালো কয়েকজন। শুরু হয়ে গেছে অবাধ লুঠপাট। ঘরে ঘরে ঢুকে যা যা পারছে তুলে নিচ্ছে।

Also Manufacturing Premium Apparels & Clothing

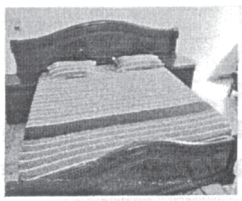

LAKRA INDUSTRIES LTD.

E-200-01, Phase - IV, Focal Point, Ludhiana - 141 010 (Pb.) India
Ph. : +91 161 4696969, 4696900, Fax : +91 161-2670263
E-mail : lakra@lakragroup.com, Website : www.Lakragroup.com

ANOOPAM

ISO 9001-2000 Certified

METAL INDUSTRIES

Manufacters & Exporters

AIMEX BRAND ALLEN BOLTS, GRUB SCREWS, ALLEN SCREWS &CYCLE PARTS

B-6, Textile Colony, Ludhiana - 141 003 (India)
Tel. (O) : 0161-2226591, 2222326, Fax : 91-161-5013390
e-mail : annopam_met@hotmail.com

কিন্তু ওরা বাধা পেল সন্দীপবাবুর বাড়ি ঢুকতে। দরজার সামনে আঁশবটি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল অপর্ণা। এবার সত্যি ভয় পেয়েছে ওরা। পিছু হটলো। অপর্ণার মনে হলো, শুধু নিজের বাড়িটা বাঁচালে হবে না, পুরো কলোনিটাকে রক্ষা করতে হবে। বটি নিয়ে সে একা এগিয়ে যায় আক্রমণকারীদের দিকে। ওরাও খানিকটা পিছিয়ে যায়। কিন্তু একজন পেছন থেকে লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে অপর্ণাকে। হাতে বটি ছিটকে যায় অপর্ণার, আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে। আর তখনই ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণকারীর দল। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে অপর্ণাকে। মা অপরাজিতা উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে থাকে তাদের পেছনে।

দেগঙ্গা বাজারে কলোনি আক্রমণের খবর যেতে দেরি হলো না। সন্দীপবাবু পড়িমরি করে দোকানের ঝাঁপ ফেলে বাড়ির দিকে ছুটলেন। সদর দরজা হাট করে খোলা। পুরো কলোনিটা যেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত। কারও মুখে কথা নেই। সন্দীপবাবু কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলেন— আমার মেয়ে বউকে দেখেছো?

কেউ কোনো উত্তর দিতে পারল না। সবার মুখ থমথমে। রাতুল কয়েকজনকে নিয়ে এলো সন্দীপের কাছে বলল— চলো কাকু। ওদিকটা একবার দেখি।

ওরা টর্চ নিয়ে এগিয়ে গেল যেদিকে অপর্ণাকে নিয়ে গেছে। মাঠের মাঝখান দিয়ে রাস্তা, রাস্তার পাশে পাম্প হাউস।

রাতুল বলল— একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছ কাকু?

ওরা এগিয়ে যেতে কয়েকজন ছুটে পালালো।

— সত্যি পাম্প হাউসের ভিতর থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা যাচ্ছে। সবাই এগিয়ে গেল সেদিকে। দরজার বাইরে থেকে ছিটকিনি দেওয়া। ছিটকিনি খুলে ভিতরে টর্চের আলো ফেলতে দেখা গেল বিধ্বস্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে অপর্ণা, মা বসে আছে তার পাশে। আর্তনাদ করে ওঠেন সন্দীপবাবু।

— কি হয়েছে মা?

অপরাজিতা বলে— তোমরা এতক্ষণে এলে?

রাতুল বলল— চলো অপুকে নিয়ে চলো।

সবাই ধরাধরি করে অপর্ণাকে বাইরে আনে। সন্দীপবাবু পাঁজাকোলা করে বাড়ি এনে বিছানায় শুইয়ে দেন। রাতুল বলে কাকু আমাদের তো এখন পুলিশের কাছে যেতে হবে। কাকিমা তুমি একবার দেখো ওকে ডাক্তার দেখাতে হবে কিনা? ততক্ষণে কলোনির অনেকেই এসে গেছে সন্দীপবাবুর বাড়িতে। পুলিশের গাড়ির শব্দও শোনা গেল। কার্তিক বলল— বাবুদের ঘুম ভেঙেছে, এসেছেন।

— আসতে দে না।

— ওরা এসে আর কি করবে? যা হবার তা তো হয়েই গেছে।

— ওরা আসবে কি করে এতক্ষণে তো থানায় নেতা বসেছিলেন।

পুলিশ অফিসার এগিয়ে এসে বলল— আচ্ছা, কি হয়েছে বলুন তো?

— কি হয়েছে সেটা নিজের চোখে দেখুন গিয়ে, মন্দিরে যান। বাড়িগুলোর অবস্থা দেখুন। আর এই বাড়িতে...

— এই বাড়িতে কিছুই হয়নি অফিসার, আপনি বাইরেরটা দেখুন।

অফিসার মন্দিরের দিকে চলল, তাকে অনুসরণ করল অনেকে। বেশ কয়েক জনের স্টেটমেন্ট নিয়ে সকালে থানায় দেখা করতে বলে অফিসার চলে গেল।

রাতুল বলল— একটা পুলিশ কেস করবে না কাকু?

— না।

দৃঢ়ভাবে বললেন সন্দীপবাবু। কলোনির নন্দবাবু পাশ করা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার, তিনি নিজে এসে দেখলেন অপর্ণাকে। ওষুধ দিলেন। অপর্ণা একটা কথাও বলেনি। সেই রাতে কলোনির অনেকের খাওয়া হয়নি, ঘুমও হয়নি। শেষ রাতের দিকে একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল অপরাজিতার। চোখ লেগে এসেছিল সন্দীপবাবুরও। অপরাজিতার আর্ত চিৎকারে জেগে উঠলেন তিনি। বললেন— কী হলো?

— ওগো মেয়ে নেই, এই তো আমার পাশেই বসেছিল। কখন উঠে চলে গেছে বুঝতে পারিনি।

— সব জায়গায় দেখেছো? ওর ঘরে, বাথরুমে?

— সব, সব জায়গায় দেখেছি, কোথাও নেই।

ওদের কথাবার্তা শুনে আশপাশের বাড়ি থেকে লোকজন চলে এসেছে। জগা বারাসাতে লেদ কারখানায় কাজ করে। শক্তপোক্ত চেহারা একটু রগচটা। ঘটনার সময় সে থাকলে একটা কিছু করে ছাড়ত। সে বলল— কি হয়েছে সন্দীপকাকু?

সন্দীপ কোনো জবাব দেয় না। জগা অপরাজিতাকে জিজ্ঞাসা করে—

কি হয়েছে কাকিমা?

— আমার মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।— অপরাজিতা বলে।

শুনে সবাই যেন একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠে— সে কি!

তারপর শুরু হলো খোঁজাখুজি। কিন্তু সেই রাত্রে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না অপর্ণাকে। পরদিন সকালে সন্দীপবাবুর আপত্তি সত্ত্বেও কলোনির সবাই জোর করে থানায় ডায়েরি করল। কলোনি জুড়ে একটা থমথমে ভাব। সেদিন কেউ কাজে বেরুলো না। এখানে ওখানে জটলা। এবার আসতে শুরু করল প্রচার মাধ্যমের লোকেরা দলে দলে। কেউ ছবি তুলছে, কেউ প্রশ্ন করছে। ভাঙা মূর্তিগুলি তখনও মন্দিরের সামনে পড়ে আছে। আজ আর পুজো হবে না মন্দিরে। বিকেলে চট্টল সমিতির কয়েকজনকে ডেকে পাঠাল থানায়। মুসলমানদের মধ্যেও অনেককেই ডাকা হল। ওরা বলল— হিন্দুদের ওই পুজো মণ্ডপ আমাদের কবরস্থানের উপর করা হয়েছে। ওটা আগে সরাতে হবে, তারপর অন্য কথা।

চট্টল সমিতির একজন বলল— এই পুজো মণ্ডপ কি আজকে করা হয়েছে? এত বছর ধরে তো এই আপত্তি শোনা যায়নি।

— আজকে সময় এসেছে আপত্তি তোলার। ওই মণ্ডপ সরাতেই হবে। নয়তো আরও আগুন জ্বলবে।

জগা বলল— জ্বলুক আগুন। দেখি কতো আগুন তোমরা জ্বালাতে পারো। আমরা ওই মণ্ডপ তুলবো না।

চট্টল সমিতির সবাই বলল— আমরা ওই মণ্ডপ তুলবো না, প্রাণ যায় যাক।

তুমুল হট্টগোলের মধ্যে পণ্ড হল আলোচনা।

অফিসার বলল— এনিয়ে আবার বসবো। এখন যান আপনারা। এলাকায় অশান্তি ছড়াবেন না। তাহলে কিন্তু পরিণতি খারাপ হবে, আসুন।

সবাই চলে গেলে সন্দীপবাবু কয়েকজনকে নিয়ে অফিসারের কাছে আসেন। অফিসার ওদের দেখে বলল— আপনাদের তো চলে যেতে বলেছিলাম, আবার কী চাই?

— স্যার, আমার মেয়ের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল?

— আপনার মেয়ে মানে?

— সকালে আমরা যে ডায়েরি করে গেছি, অপর্ণা চৌধুরী... — রাতুল বলল।

— ও! তা ডায়েরি করলে তো আর সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ পাওয়া যায় না। সময় দিতে হবে।

— আর কাল রাত্রে এই মেয়েটার উপর পাশবিক অত্যাচার হয়েছে স্যার।

— মেয়েটির বাবা কে?

সন্দীপবাবু বললেন— আমি স্যার।

— কিন্তু কাল ওই ঘটনার পর আমি যখন ইনভেস্টিগেশনে গিয়েছিলাম আপনি আপনার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আপনার বাড়িতে কিছু হয়নি। কি ঠিক বলেছি তো?

— লজ্জায় অপমানে আমার মাথার ঠিক ছিল না স্যার।

— দেখুন, আইনটা ছেলেখেলার জিনিস নয়। আর আপনারা সেটাকে তাই মনে করেন। যখন যা খুশি বলে ফেললেন। পরিস্থিতি বুঝে বয়ান পাল্টালেন। যান যান বাড়ি যান। ডায়েরি করেছেন, খুঁজে দেখা হবে।

— এত বড় অন্যায়ের কোনো বিচার হবে না স্যার? এতগুলি লোক সাক্ষী!

— সবথেকে বড় সাক্ষী তো আপনি, আপনি তো নিজের মুখেই বলেছেন কাল। আপনার বাড়িতে কিছুই হয়নি। কোনটা যে আপনার সত্য কথা, আর কোনটা মিথ্যে, বুঝবো কি করে? যান যান, আমার অন্য কাজ আছে। কি হলো, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

— স্যার।

— রহমত এদের বের করে দাও।

অফিসার উঠে চলে গেলেন। রহমত আদেশ পালন করার আগেই সন্দীপবাবু সঙ্গীদের নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এলেন।

সেই রাতেই চট্টল সমিতি রাত পাহারার ব্যবস্থা করল। ছেলে বুড়ো সবাই রাস্তায়, কারও চোখে ঘুম নেই।

জগা বলল— আমি থাকলে জান নিয়ে নিতাম ক'টার।

কালীপদ ঘোষ বছর দুই আগে ওপার থেকে এসে বাড়ি করেছে। সামাজিক কাজকর্মে আগ্রহী। বলল— এই দেশেও যদি এই অবস্থা হয় তবে ভিটেমাটি ছেড়ে এলাম কি করতে?

অনন্ত বলল— রায়বাবুর অবস্থা ভাল নয়, কোমরে লেগেছে খুব।

সনাতন বলল— অপর্ণার খোঁজ পাওয়া গেল না? কোথায় যে গেল মেয়েটা। এত ভাল মেয়ে হয় না রে! পাড়াটাকে কেমন মাতিয়ে রেখেছিল।

— দূর আমাদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না। শুধু পড়ে পড়ে মার খেতে হবে। ওপারেও খেয়েছি, এপারেও খাচ্ছি। —একজন হতাশার সুরে বলল—

সনাতন ঘোষ বলল— ওরা যখন এখানে ভাঙচুর করছে, লুঠপাট করছে, অপর্ণাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, তখন তো আমাদের মহান নেতা থানায় বসে গল্প করছে। থানাপাড়াতে অনেকেই দেখেছে।

— সে তো বটেই। নইলে এই ঢিলছোঁড়া দূরত্বে পুলিশ আসতে এতক্ষণ লাগলো?

এভাবেই সেই রাত কাটে। ভোর হতে না হতেই যে যার বাড়ি চলে গেল। একটু ঘুমোতে হবে। সবে ঘুমটা এসেছে জগার। রাতুলের ডাকে উঠতে হলো। রাতুল বলল— জগাদা ওঠ ওঠ। দেখ পুলিশ র‍্যাফ এসে মন্দিরটা ঘিরে ফেলেছে।

জগা এক লাফে উঠে পড়ে। ছোটে মন্দিরের দিকে। তখন কয়েকশো পুলিশ র‍্যাফ মন্দির এলাকা ঘিরে দাঁড়িয়েছে। চট্টল সমিতির অনেকেই এসে গেছে। প্রশাসন আটঘাট বেঁধেই এসেছে। পুলিশ এলাকা ঘিরে আছে আর মিস্ত্রিরা এসে মন্দির ভাঙতে শুরু করে। চট্টল সমিতির লোকেরা দেখছে, তাদের স্বপ্নের মন্দির ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মন্দিরের ঠিক অর্ধেকটা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে শুরু করল প্রাচীর দেওয়ার কাজ। অসংখ্য লেবার মিস্ত্রি সন্ধ্যার আগেই তৈরি করে ফেলল সুদীর্ঘ প্রাচীর। সেই প্রাচীর পাহারার জন্য পুলিশ নিয়োগ হল। কিন্তু চট্টল সমিতির পুজো?

প্রশাসন জানিয়ে দিল পুজো করতে হবে সেই অবশিষ্ট অর্ধেক মন্দিরের মধ্যে। পাঁচটার বেশি আলো জ্বালানো যাবে না। রাত আটটার পর মাইক বাজানো যাবে না। এইসব শর্ত মানলে তবে পুজোর অনুমতি দেবে প্রশাসন। চট্টল সমিতি এইসব শর্ত মানেনি, তাই সেবছর তারা পুজোও করেনি। এই ঘটনার প্রতিবাদে ওই অঞ্চলের ছাব্বিশটা দুর্গাপুজো কমিটি তাদের পুজো সেই বছর বন্ধ রাখে। আনন্দের আবহ বিষাদের রাগিনীতে পরিণত হয়। সেই বিষাদ আরও ঘনীভূত হয় অপর্ণার অন্তর্ধানে। অপর্ণার কোনো সন্ধান কোথাও পাওয়া যায়নি। সেই প্রতিবাদী মেয়েটা নীরবে হারিয়ে গেল। অপর্ণার বাবা-মা এবং স্থানীয় মানুষদের আশা অপর্ণা একদিন আসবে মহিষমর্দিনীরূপে।

NAVYUG®

BSCIC Certifications Private Limited — ISO 9001:2008

IS : 2494 — CM/L NO. 9065679

VINÇOTTE — ISO/TS 16949:2009

B0089/0104:0807

QUALITY SPEAKS ITSELF

MANUFACTURERS & EXPORTERS OF:
V, COGGED & POLY BELTS
FOR INDUSTRIAL & AUTOMOTIVE APPLICATION

Recognised Export House by Govt. of India

NAVYUG (INDIA) LIMITED

G.T. ROAD, BYE-PASS, JALANDHAR-144 009
Ph.: 0181-2420551-552-053-054 Fax : 0181-2420553
E-mail : info@navyugbelts.com Website : navyugbelts.com

C ®
BRAND

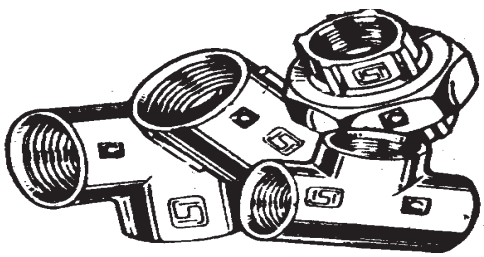

ISI
MARKED

HIGH GRADE
MALLEABLE IRON
HOT GALVANISED
PIPE FITTINGS

MFD. BY. Ph. : 260-1548/1566 R-256305, 257593.

CRESCENT ENGG. CORP.

G. T. ROAD, BYE PASS, JALANDHAR

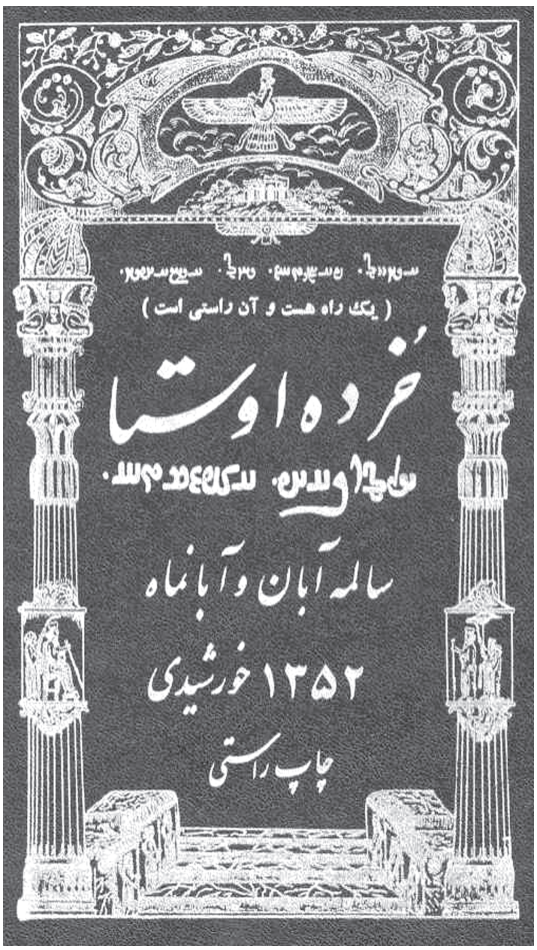

ঋকবেদ ও জেন্দ আবেস্তা

রজত পাল

পার্শীদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দ আবেস্তা, যার সঙ্গে ঋকবেদের অসাধারণ সাদৃশ্য বিষয়ে পণ্ডিতমহলে আলোচনার অন্ত নেই। একসময় আর্যদের ভারত আগমন-তত্ত্বের প্রবক্তারা মনে করেছেন আর্যরা ভারত আগমনের পূর্বে ইরান বা পারস্যে একসঙ্গে কিছুকাল বসবাস করত এবং পরবর্তীকালে তাদের একটি শাখা ভারতে চলে আসে এবং এদেশে বৈদিক সভ্যতার বিকাশ ঘটায়।

বর্তমানে এই মতটির গ্রহণযোগ্যতা বিশেষ নেই। তবে এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে বেদ ও আবেস্তা-র মধ্যে প্রাপ্ত সাদৃশ্যের বিষয়টি একটু দেখে নেওয়া দরকার।

নবম শতাব্দীর আরবি ঐতিহাসিকদ্বয় তারবি ও মাসুদি জানিয়েছিলেন যে মূল জেন্দ আবেস্তা ১২০০

চর্মখণ্ডে লিপিবদ্ধ ছিল। প্লিনি প্রথম শতাব্দীতে বলেছিলেন জরথুস্ট নাকি ২০ লক্ষ শ্লোক রচনা করেছিলেন। এই বিপুল আবেস্তার একটি ক্ষুদ্র অংশ বর্তমানে পাওয়া যায়। আবেস্তার প্রাপ্ত অংশটিতে মূলত চারটি বিভাগ দেখা যায়—

১) যজ্ঞ বা যশ্ন = সঙ্গীতাংশ.

২) গাথা = পাঁচটি বিশেষভাবে বিভক্ত ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীতাংশ।

৩) বেন্দিদাদ = দেবতা ও অন্যান্য বর্ণনা।

৪) যস্ত বা যশৎ বা যষ্ট্ = নানা স্তোত্রাবলী।

যশ্ন বা যষ্ণ শব্দটি সংস্কৃত বা বৈদিক যজন্ বা যজ্ঞ শব্দ হতে উদ্ভূত মনে করা যেতে পারে।

যজ্ঞ > যষ্ণ

যজন্ > যশন্ > যশ্ন > যশ্ন

কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন বেন্দিদাদ্ শব্দটি 'বিন্দেদ্-দৎ' বলে মূল শব্দ থেকে এসেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সংস্কৃত শব্দ 'বন্দিতাতঃ' শব্দের অপভ্রংশ। 'বন্দিতাতঃ' শব্দটির অর্থ হলো 'হে তাতঃ বা পিতা, তোমাকে বন্দনা করি।

বন্দিতাতঃ > বন্দিদাদ > বেন্দিদাদ

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে বেন্দিদাদ অংশটি আবেস্তাপন্থীদের পরমপিতা আহুরমাজদা-র উপাসনা পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ।

অপরদিকে 'আবেস্তা' শব্দটি সম্ভবত সংস্কৃত 'অবস্থা' শব্দ থেকে আগত

অবস্থা > অবস্তা > আবেস্তা (স্বরসম্পৃতি)

'অব্' শব্দটির বৈদিক অর্থ নিশ্চিত। সুতরাং 'অবস্থা' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'যা নিশ্চিতরূপে স্থিত'। বাঙালির 'অবস্থা' শব্দটি উচ্চারণ করে 'অবস্তা' অনেক সময়।

'জেন্দ' শব্দটির বিষয়ে মনে করা হয় শব্দটি ইরাণি ভাষায় Zan 'জান' ধাতু থেকে আগত। 'জান্' ধাতুর অর্থ জানা। সংস্কৃত 'বিদ্' ধাতুরও অর্থ এক। যা থেকে 'বেদ' কথাটির সৃষ্টি।

কিন্তু 'জেন্দ' কথাটির উৎপত্তি সম্পর্কে একটি ভিন্ন মত এখানে তুলে ধরতে চাই। পারসিকরা 'সিন্ধু'কে 'হিন্দু' উচ্চারণ করত। তারা বৈদিক 'সপ্তসিন্ধু'কে বলত 'হপ্তহিন্দু'। 'স'কে 'হ' উচ্চারণ করার বহু নিদর্শন আবেস্তাতে পাওয়া যায়। যেমন—

সংস্কৃত — অসুর সোম সপ্ত সেনা মাস

আবেস্তা — অহুর হোম হপ্ত হেনা মাহ

বৈদিক সভ্যতা নানা স্থানে বিস্তার লাভ করার পর তৎকালীন ভারতবর্ষ পারসিকদের কাছে 'হিন্দ' নামে পরিচিত হতে থাকে।

ভাষাতাত্ত্বিক আর একটি পরিবর্তনের কারণে (যা আবেস্তা-র ভাষা বিবর্তনের একটি বৈশিষ্ট্য) বৈদিক 'হ' আবেস্তাতে সর্বত্র 'জ'-তে পরিণত হয়। যেমন—

সংস্কৃত — হৃদয় হোতা আহুতি বাহু হস্ত অহি হিম

আবেস্তা— জরদয় জোতা আজুতি বাজু জস্ত অজি জিম

এ প্রসঙ্গে আমরা বিচার করে দেখতে পারি বিহার, উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলে ভোজপুরী মৈথিলী হিন্দি (যা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত) মাসকে মাহ ('এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর'— বিদ্যাপতি), বাহু কে বাজু (বাজুবন্ধ) শব্দগুলির রূপান্তর দেখা যায়।

নানা পণ্ডিতের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি জরথুষ্ট রচিত বা সংকলিত ধর্মগ্রন্থটি আদিতে কেবলমাত্র 'আবেস্তা' নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবত সিন্ধু বা হিন্দ অঞ্চলের সাথে সম্পর্কিত বলে এটি পরবর্তী সময়ে 'হিন্দ আবেস্তা' বলে পরিচিত হয় যা পরবর্তীকালে 'জেন্দ আবেস্তা' নামে বিখ্যাত হয়।

বৈদিক সংস্কৃত থেকে আবেস্তার ভাষায় পরিবর্তন বা Etymologacal কয়েকটি বৈশিষ্ট এখানে দেখানো হলো—

১) সংস্কৃত (সং) 'ত' আবেস্তা (আ)-তে 'থ' তে পরিণত হয়েছে।

২) সং 'এ' স্থলে আ-তে 'ওই' ব্যবহৃত হয়

গবে > গবোই।

৩) সং 'ঋ' স্থলে 'অর' বা 'অরে' উচ্চারিত হয়েছে।

৪) সং বর্গের চতুর্থ বর্ণের স্থলে আবেস্তাতে তৃতীয় বর্ণের ব্যবহার দেখা যায়—

ভূমি > বূমি; ধারয়ৎ > দারয়ৎ

৫) আবেস্তা-তে অপনিহিতি-র ব্যবহার ব্যাপক মাত্রায় (পরবর্ণের প্রভাবে পূর্ব বর্ণের পরিবর্তন)—

ভবতি > ববইতি

ইত্যাদি।

সংস্কৃত বা বৈদিক ব্যাকরণের সঙ্গে আবেস্তা-র ব্যাকরণগত সাদৃশ্য বিস্ময়কর—

বৈদিক অস্মৈ, কস্মৈ, যস্যাম্, জেন্দ আবেস্তা-তে লেখা হয়েছে অন্মৈ, কন্মৈ, যেস্যাম্ রূপে।

সং 'অস্মৈ' এং আ. 'অন্মৈ' শব্দদুটির অর্থ এক (ইহাদেরকে)।

আবেস্তাতে লেখা আছে 'কস্মৈ দেবায় বিধেম', যার বৈদিক উদাহরণ হল, 'কস্মৈ দেবায় বিধেম'। উভয়ত অর্থ হল, 'কোন দেবতাকে উৎসর্গ করব'।

সং-এ কুকুরকে 'শ্বন' বলা হয় যা আবেস্তা-তে 'স্পন'।

জরথুস্ত্র

এই শব্দটির দুই ভাষায় শব্দরূপগত মিলও অসাধারণ।

	শ্বন / স্পন		
	প্রথমা	**দ্বিতীয়া**	**চতুর্থী**
	একবচন	**একবচন**	**একবচন**
সংস্কৃত	শ্বা	শ্বানম্	শুনে
আবেস্তা	স্পা	স্পানম্	সুন

সংস্কৃত 'পথিন' শব্দটি আবেস্তাতে 'পথন' রূপে ব্যবহৃত।

	প্রথমা	**প্রথমা**
	একবচন	**বহুবচন**
সংস্কৃত	পন্থা	পন্থানঃ
আবেস্তা	পন্তা	পান্থানো

আবেস্তার ভাষার সাথে সংস্কৃত ভাষার মিলও আশ্চর্যজনক।

হাবনীম্ আ রতূম আ	সবনিম্ আ ঋতুম আ
হওমো উপাইৎ জরথুশত্রম্	সোম উপেৎ জরথুষ্ট্রম।
আত্রম্ পইরি-য়ওজ্দথন্তম্	অত্রিম পরি-থোস্ দর্বন্তম্
গাথাস্-চ-স্নারয়প্তম।	গাথাশ্চ (অপি) শ্রাবয়ন্তম্।।
— আবেস্তা	— পুনর্গঠিত সংস্কৃত

বৈদিক আর্য বা সংস্কৃত এবং আবেস্তা-তে যে সকল শব্দ একই রূপ, অর্থ ও ভাব বহন করে সেগুলি হল এরকম—

পিতর, মাতর, ভ্রাতর, পশু, গো, বৈদ্য, মনস্, যম, বরুণ, বায়ু, রথ, গন্ধর্ব, অথর্বণ, গাথা, ইন্দ্র, দেব, জন, বজ্র ইত্যাদি।

এবার আমরা দেখে নেব কিছু উদাহরণ যাতে বোঝা যায় ঋকবেদ ও আবেস্তা-র মূলগত সাদৃশ্য কী গভীর।

ঋক বেদ	**আবেস্তা**
ঋক ১০/৮৭/২১	গাথা ১৭/৮ যশ্ন ৫৩/৪
১. মাহান্তা মিত্রা বরুণা	মহান্তা মিত্রা বরুণা দেবাব্

সম্রাজা দেবাব্ অসুরা	অহুরা/সখে যা ফেধ্রোই
সখে সখায়াম অজরো	বীদাৎ/পাত্যয়ে চা, বাস্ত্রেব্যো
জমিম্মে অগ্নে মর্ত্যান্	অৎচা/ঋত্রতবে অগার্ডনো
অমর্ত্ত্যস্ ত্বং নঃ।	অসবব্যো।
২. মজদাঃ যকৃত্ব স্মরিষ্ঠঃ	২৯/যশ্ন ১৭/৪
	মজদাও সখারে মইবিস্তো
	গাথা ১৭/যশ্ন ২৯
৩. এতাবতীং বসুমনসাং	অবৎ বহুমনংহা, যা হুসেইতিস্
দেহি যা সুক্ষিতিম্ রামাং	রা মাং চ দাৎ।
চ দধাতি।	
৪. অথঃ নঃ অসতু	অথা নে অংহৎ
যথা স্ব বশতি	যথা হ্বো বশৎ
৫. অথর্ববেদ ৭ম মণ্ডল	
৬৬ অধ্যায়	
যদি অন্তরীক্ষে যদি	পৃশ্নিখণ্ডে 8th Chapter
বাতে আস	হুবহু এক
যদি বৃক্ষেষু যদি	
বোলপেষু, ইত্যাদি	

এ সকল প্রমাণের মাধ্যমে একথা নিশ্চিৎভাবেই বলা যায় যে, আবেস্তাপন্থী এবং বৈদিক পন্থীদের মধ্যে সাংস্কৃতিগত এক মূল সাদশ্য বর্তমান ছিল। উভয় গ্রন্থাদির রচয়িতারা এবং ঐসকল গ্রন্থাদিমতের উপাসকরা মূলত একই ধর্মসংস্কৃতির ধারা থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন। ভাষাতাত্ত্বিকরা অতি সহজেই উপরের উদাহরণগুলো থেকে অনুধাবন করবেন যে ঋকবেদাদি গ্রন্থগুলির রচনা আবেস্তা রচনার অনেক পূর্বে।

পার্সি সম্প্রদায়ের পুরোহিতেরা হলেন অথর্বণ। আবেস্তা-তে অথর্বণ শব্দটির ব্যবহার ঐ অর্থেই করা হয়েছে। অথর্বণ শব্দের প্রথমা বিভক্তির একবচন হল অথর্বা। অথর্ববেদের রচয়িতা হিসাবে বৈদিক সাহিত্যে অঙ্গিরাবংশীয় অথর্বা ঋষিদের নাম পাওয়া যায়।

পণ্ডিতেরা একথা মেনে নিয়েছেন যে, অথর্ববেদ হল চতুর্বেদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। বলা হয় বেদ প্রথমে নাকি ছিল ত্রয়ী বা তিনটি। ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ; বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে তিনটি বেদ হিসাবে ঋক-সাম-যজু-র উল্লেখ থাকলেও সেগুলিতে অথর্ব বেদের কোনো উল্লেখ নেই।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অথর্ববেদ (যার মোট স্তবক সংখ্যা ৬০০০)-এর এক ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ প্রায় ১০০০ স্তবক ঋকবেদ থেকে গৃহীত (History of Indian Literature - Winternitz) ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব (যিনি আর্যদের ভারতে আগমন তত্ত্বে বিশ্বাসী) পর্যন্ত স্বীকার করেছেন ঋকবেদ থেকে অজস্র অংশ নেওয়া হয়েছে অথর্ব বেদে (বৈদিক সভ্যতা - পৃ: ৪১)।

এহেন অথর্ব বেদের সঙ্গে আবেস্তার যোগসূত্র একথাই প্রমাণ করে যে, ঋকবেদ, আবেস্তার অনেক পূর্বে রচিত এবং ঋকবেদপন্থীরা ইরান থেকে ভারতে প্রবেশ করেনি। না হলে ইরানে আবেস্তা ব্যতীত বেদের আদি রূপের সন্ধান পাওয়া যেত।

Winternitz বলেছেন (History of Indian Literature) অথর্ববেদ হল যাদু গ্রন্থের জ্ঞান (Knowledge of magic formulas) [Vol.-1, p.119)।

ঋকবেদ থেকে (৭/৭৬/৪-৫) আমরা অনুধাবন করতে পারি যে বৈদিক যুগে আঙ্গিরসগণ বা অথর্বণরা অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী রূপে চিহ্নিত ছিল। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ভারতীয় দর্শন - পৃঃ ১১৭) জানিয়েছেন যে, যখন যাদুমন্ত্রগুলি সংহিতারূপে সংকলিত হয়েছে তখন বৈদিক মানুষদের সমাজ আর আদিম সমাজ নয়।

আঙ্গিরা — অথর্বণ গোষ্ঠী, বিশেষত ভৃগু গোষ্ঠীরা যজাদি প্রথাকে সামনে রেখে নানা তুকতাক জাতীয় 'ব্ল্যাক ম্যাজিক' অভ্যাস করতেন। এই গোপন বিদ্যাকে বলা হল ভৃগুবিদ্যা। আর্যাবর্তের অন্যান্য ঋষিকুলের সঙ্গে ভৃগুগোষ্ঠীদের বিরোধ ছিল। নানা ক্ষত্রিয় রাজাদের গুরু বা পৃষ্ঠপোষকরূপে নানা ঋষিকুল অবস্থান করছিলেন। নৃপতিদের পারস্পরিক বিরোধের সঙ্গে সঙ্গে ঋষিকুলও বিরোধিতায় যুক্ত হয়ে পড়ে। ঋকবেদে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের পৌরোহিত্যে সুদাম ও দশ রাজার যুদ্ধ এই মতকে সমর্থন করে। প্রথমদিকে বলবান হলেও ভৃগুগোষ্ঠীরা এদেশে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে।

পৌরাণিক মতে, পরশুরাম হলেন ভৃগুর প্রপৌত্র (ভৃগু - ঋচিক - জমদগ্নি - পরশুরাম)। ওনাকে সর্বত্র 'ভার্গব' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করেন (কথিত আছে উনি ২১ বার ধরিত্রী নিঃক্ষত্রিয় করেন)। তিনি নিজে বা তাঁর সম্প্রদায় রামের হাতে পরাস্ত হয়, ভীষ্মর গুরু হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেন, দ্রোণকে সজ্ঞানে ও কর্ণকে অজান্তে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করেন।

পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে ভৃগু পুত্র শুক্রাচার্য অসুরদের পুরোহিত তথা কুলগুরু ছিলেন। অর্থাৎ ভৃগুপন্থীদের সঙ্গে দেব-ব্রাহ্মণ্য গোষ্ঠীদের বিরোধিতার কথা পাওয়া যাচ্ছে।

অসুররা ক্রমাগত পরাস্ত হতে থাকলে ভৃগুপন্থীদের এক বৃহৎ অংশ ভারতের মাটি ত্যাগ করেন। এই ভৃগুপন্থীদের একজন হোতা ছিলেন জরথুষ্ট।

আবেস্তা-র উপাসকদের সঙ্গে সম্পর্কিত Media নামক স্থানের ব্যাখ্যায় কর্ণেল টড বলেছিলেন—

'প্রাচীন ব্রহ্মাবর্তবর্ষের রাজা অজামেধের পাঁচ পুত্রের মধ্যে দুজন ভারতবর্ষ ত্যাগ করে উত্তর-পশ্চিমে চলে যান। তারা সেখানে নতুন রাজ্য স্থাপন করেন এবং পিতৃস্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাদের পদবি 'মেধ' রাখেন ও তাদের বাসস্থানের নাম রাখেন 'মেধদেশ'।

এই মেধদেশই চলতি ভাষায় মেধিয়া হয়ে ক্রমে Media নামের উৎপত্তি ঘটায়।

Todd পারসীদের সম্পর্কে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে—

The country from which Persians are said to have come, can no other be than the North-West part of Ancient India।

প্রায় ১৫০ বছর আগে Maxmuller (Lecture on Ane Sanskrit) বলেছিলেন—

"The Zorastrians were a colony from Northern India"।

A. T. Olmstead (History of the Perian Empire) বলেছেন যে, ৯০০ বিসি থেকে বারবার অভিযান চালিয়ে ৬০০ বিসি নাগাদ অ্যাসিরিয়রা পারস্যের আগন্তুক (? = আবেস্তাপন্থী) শাসক গোষ্ঠীদের ক্ষমতাচ্যুত করে। ঐ অঞ্চলে Parsua (পরসূয়া) ও Parasumash (পরসুমস) নামক দুটি প্রাচীন গ্রামের নাম পাওয়া গেছে। দীপংকর লাহিড়ী তার 'বিলুপ্ত জনপদ : প্রচলিত কাহিনি (পৃঃ ১১৮) নামক গ্রন্থে পরশু বা কুঠার টোটেমধারী গোষ্ঠীদের কথা এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। আমরা অনুমান করতে পারি ঐ দুটি গ্রামের নামকরণ পরশুরাম (ভৃগুগোষ্ঠী) গোষ্ঠীদের নাম থেকে হয়ে থাকতে পারে।

আলবেরুণীয় 'তহকিক-ই-হিন্দ' (আলবেরুণীর দেখা ভারত — প্রেমময় দাশগুপ্ত) থেকে জানা যায়, গ্রীসের অনেক প্রাচীন পণ্ডিত জরথুষ্ট সম্পর্কে জানতেন। জরথুষ্ট নামটি গ্রীক শব্দে পাওয়া গেছে। 'উষ্ট্র' আবেস্তার ভাষায়, 'উশতর' বলে উচ্চারিত— অর্থ হল মরুতাপে দগ্ধ। প্রাচীন ভারতীয় এক পৌরাণিক চরিত্র জরৎকারু নামক ঋষির নামটি এক্ষেত্রে বিবেচিত হতে পারে—

জরৎকারু > জরথ উশতর > জরথুষ্ট্র

'ত' থেকে 'থ' উচ্চারণ আবেস্তার বৈশিষ্ট্য।

'জরৎকারু' শব্দটির অর্থও হল 'যার শরীর (কারু) অতি প্রাচীন (জরৎ)।

আবেস্তার লোকেরা যে ভারত থেকে পশ্চিমদিকে অভিসরণ করে পারস্যে এসেছিল একথা কিভাবে নির্ণয় নেওয়া যেতে পারে তার সপক্ষে কিছু কথা বলা যাক।

ভারতীয় পুরাণাদি পাঠ করলে দেখা যাবে যে, আর্য সভ্যতা ভারতে বিকশিত হবার দ্বিতীয় পর্যায়ে মানব-দানব-অসুর-দেব ইত্যাদি নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সায়ম্ভুব থেকে বৈবস্বত মনু পর্যন্ত সাতজন মনু (যদিও পরবর্তীকালে আরও ৭জন মনু ছিলেন— বিস্তারিত বর্ণনা 'আর্য দিগন্তে সিন্ধু সভ্যতা' — লেখক)-র আমলে তাদের সন্তান ও প্রজারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সভ্যতার বিকাশ ঘটায় (জলা জায়গা ভরাট করে বা অনার্যদের থেকে দখল করে উপনিবেশ স্থাপন করে। বিস্তারিত ঐ : লেখক)। অসুর গোষ্ঠীর কথা বর্তমানে নানা আলোচনায় উঠে আসছে (বিস্তারিত ঐ পুস্তক : লেখক)। দেব ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীদের সঙ্গে লড়াইতে জিততে না পেরে (Crushed -এর মতন দীর্ঘ লড়াই হয়েছিল ধাপে ধাপে) অসুরেরা প্রান্তিক এলাকায় চলে যায়। একটি অংশ আফগানিস্তান ছেড়ে ইরানে এসে উপস্থিত হয় (লক্ষণীয় যে আফগানিস্তান পর্যন্ত বৈদিক সভ্যতার বিস্তার ছিল) ইরানে আসা ঐ গোষ্ঠী অসুরপূজক ছিল এবং তাদের দেবতা ছিল আহুর মাজদা বা অসুর মহান বা অসুর শ্রেষ্ঠ।

'বেন্দিদাদ' নামক অংশে জরথুষ্ট্রকে সম্বোধন করে আহুর মাজদা বলেছেন—

'আমি মানুষ্যদিগের জন্য (এক্ষেত্রে মনুর সন্তান বা প্রজা তথা মানব) অত্যুৎকৃষ্ট উর্বর ভূখণ্ড প্রদান করছি। .... সেই ভূখণ্ড পূর্বভাগে অবস্থিত।'

আবেস্তা থেকে আবার এও জানা যায় যে, জামসেড নামক নেতার কর্তৃত্বাধীন ঐ জাতি সেই পূর্বে স্থিত ভূখণ্ড থেকে জীবজন্তু মনুষ্যহীন সমতলে উপনীত হয়।

অর্থাৎ আবেস্তাপন্থীরা ইরানে এসেছিলেন পূর্বদিকের দেশ থেকে। আমরা মৌর্য বা গুপ্ত যুগেও দেখেছি, আফগানিস্তান পর্যন্ত ভারতীয় সাম্রাজ্য। তার পরবর্তী দেশ হল ইরান।

আবেস্তার 'গাথা' অংশে জরথুষ্ট্র বলেছেন—

ক) 'আমি কোথায় যাব, কোথায় আমরা লুকাবো, কোন দেশ আমাদের স্থান দেবে...'

খ) 'হে ভগবান আহুর মাজদা! আমি তোমাকে অশ্রুজলের সঙ্গে বলছি, আমি এখন গৃহহীন হয়েছি। আমার

অনুগামীর দল ছোট হয়ে গেছে। দয়া করে আমার দিকে কৃপাদৃষ্টি দাও।'

আবেস্তাপন্থীরা দেব-ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর বিরোধী ছিলেন। তাই আর্যদেবতা ও যজ্ঞাদির প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন 'গাথা' অংশে।

— হে দেবগণ, তোমরা অশুভ শক্তি থেকে উৎপন্ন হয়েছ, তোমরা নেশাগ্রস্ত হয়েছ।

— হে মহান যজ্ঞ ধ্বংসকর্তা - তুমি কখন দেখা দেবে? ইত্যাদি।

ভাষাতাত্ত্বিকরা অতি সহজ কিছু প্রমাণ থেকেই নির্ণয় করতে পারেন ভাষার বিবর্তন। এই বিবর্তনের ধারা দেখেই বোঝা যায় কোনটি বেশি প্রাচীন। যেমন—

১) অপনিহিতি— এ রচনায় আগেই বলা হয়েছে।

উদা: বাংলা ভাষার বিবর্তনে কাঁচি > কাঁইচি

আবেস্তা ভবতি > ববইতি

২) 'ঋ' স্থলে 'র' বা 'অর'-এর ব্যবহার।

প্রাকৃত = মৃগ > ম্রিগ > মুগ

আ = বৃক্ষ > ব্রুচ্ছ বা রুচ্ছ

৩) পদান্তস্থিত বিসর্গ স্থানে এ বা ও-এর ব্যবহার

প্রাকৃত = জন: > জনো

আ = পন্থান : > পন্থানো

ইরফান হাবিব (The Vedic Age and the coming of Iron) আবেস্তা রচনাবলীকে কালের বিচারে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি প্রাচীন আবেস্তা ও অন্যটি নবীন আবেস্তা। নবীন আবেস্তাতে বিন্দেদাদ অংশে যে ১৬টি দেশ বা দাহিউয়ের বর্ণনা আছে তার সীমানা হাবিব সিন্ধু নদ পর্যন্ত দেখিয়েছেন।

এর সাহায্যে হাবিব আবেস্তাপন্থীদের ভৌগোলিক সীমানা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। হাবিব মানচিত্রের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, আবেস্তাপন্থীদের সীমানা পূর্বদিকে সিন্ধুনদ অতিক্রম করেছিল। হাবিবের এ মতকে আমরা এখানে পুনর্বিবেচনা করে দেখব। হাবিব ধরেছেন যে, আবেস্তায় উল্লিখিত ঐ ১৬টি দেশই আবেস্তাপন্থীদের বাসস্থান। কিন্তু মূল রচনায় বলা আছে, ঈশ্বর তার অনুগৃহীত মানুষদের জন্য ১৬টি দেশ সৃষ্টি করেছেন, যার একটি হল হাপতা হেন্দু (সপ্তসিন্ধু), অপর একটি হল হারখাবতী (সরস্বতী) এবং অন্য একটি হল হরোই (সরযূ) ইত্যাদি। কিন্তু সেখানে কোথাও বলা হয়নি যে, ঐ ১৬টি দেশেই আবেস্তাপন্থীরা বসবাস করতেন। বরং একথা বলা যায় যে, বৈদিক ভারতীয় সভ্যতা, বিশেষত, সপ্তসিন্ধু ও সরস্বতী সম্পর্কে আবেস্তাপন্থীদের গভীর জ্ঞান ছিল। একথা বরং জোর দিয়ে বলা যায় যে, সপ্তসিন্ধু ও সরস্বতী অঞ্চল আবেস্তাপন্থীদের থেকে প্রাচীনতর। (হাবিব স্বীকার করেছেন যে, 'প্রাচীন ও নবীন আবেস্তার সমস্ত রচনাই পরবর্তী বৈদিক যুগের সময়কালে রচিত'— বৈদিক সভ্যতা - পৃঃ ৪৪)।

হাবিব বলেছেন, নবীন আবেস্তার রচনাকাল ৯০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দ থেকে ৪০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দ। সেক্ষেত্রে প্রাচীন আবেস্তার রচনাকাল আরও ৫০০ বছর পিছিয়ে ধরা হলে তা হয় ন্যূনতম ১৫০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দ। এবার প্রাচীন আবেস্তার রচনা যদি পরবর্তী বৈদিক যুগে রচিত হয় (যা হাবিব স্বীকার করেছেন) তাহলে প্রাচীন বৈদিক (ঋক বৈদিক) রচনাকাল প্রচলিত বিশ্বাস (১৫০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দ) থেকে বহু প্রাচীন বলে প্রমাণিত হয়।

শ্রী প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (Ancient Indian Chronology, 1947) একটি সাধারণ জ্যোতিষ নির্দেশ থেকে অথর্ব বেদ ও আবেস্তার রচনাকালকে ৪৭০০ খৃস্ট-পূর্বাব্দ বলে নির্ণয় করেছিলেন।

ঋণ স্বীকার :

ভাষা বিজ্ঞান — পরেশ ভট্টাচার্য। বৈদিক সভ্যতা — ইরফান হাবিব ও বিজয় কুমার ঠাকুর। The Vedic Age and the coming of Iron -I. Habib। আলবেরুণির দেখা ভারত — প্রেমময় দাশগুপ্ত। History of Indian Leterature : Winternitz। আর্য দিগন্তে সিন্ধু সভ্যতা — রজত পাল।

মহারাষ্ট্রের ভক্ত-কবি পরম্পরা ও মারাঠা জাতীয় জাগরণ

রবিরঞ্জন সেন

কান্দা মূলা ভাজী
আবসি বিঠ্ঠই মাজী...
(পেঁয়াজ, মুলো সব্জি,
বিঠ্ঠই আছে সবেই)

ত্রয়োদশ শতাব্দী মহারাষ্ট্রের সাঁওতা নামক মুনির রচিত এই গীত সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বরানুভূতির কথা সহজ সরল ও আকর্ষণীয়ভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরে। ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ এই পাঁচ শতাব্দী জুড়ে মহারাষ্ট্রের অসংখ্য সন্ত এবং ভক্ত-কবি ভক্তির প্লাবনে সমগ্র মারাঠাভাষী অঞ্চলকে প্লাবিত করেছিলেন। চন্দ্রভাগা নদীর তীরে পন্ধরপুর নগরে অবস্থিত বিঠ্ঠল (বা বিঠোবা বা বিঠ্ঠই) মন্দিরকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলনকে ওয়ারকরী আন্দোলন ('ওয়ারকরী' শব্দটির অর্থ তীর্থযাত্রী) নামে খ্যাত। এই বিঠ্ঠল শ্রীকৃষ্ণেরই নামান্তর, যদিও তাঁর রূপ শ্রীকৃষ্ণের সাধারণ পরিচিত রূপের চাইতে আলাদা এবং তাঁর সঙ্গিণী শ্রীকৃষ্ণের সহধর্মিণী রুক্মিনী বা স্থানীয় ভাষায় রাখুমাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জ্ঞানেশ্বর থেকে শুরু করে নামদেব, সাঁওতা, চোখামেলা, নরহরি সোনার, গোরা কুম্ভার (বা কুম্ভকার), ভানুদাস, ষোড়শ শতাব্দীতে একনাথ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে তুকারাম-সহ অসংখ্য ভক্ত-কবি বিঠ্ঠলের নামগুণ গেয়ে মহারাষ্ট্রের আকাশ-বাতাস মুখরিত করেছিলেন।

এই সন্তদের মধ্যে সমস্ত জাতি-বর্ণের মানুষ ছিলেন— ভক্তির মার্গ কোনোদিনই ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে ভেদ করেনি। সমানভাবে মহিলা সন্তরাও ছিলেন— জনাবাঈ, কান্হোপাত্রা, বাহিনাবাঈ প্রমুখ। আবার মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে যে, এই ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতকই মহারাষ্ট্রে বিদেশি আক্রমণ, মুসলমান শাসন ও ধর্মীয় নিপীড়নের সময়কাল। অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রের শেষ হিন্দু রাজা যাদববংশীয় রামচন্দ্রদেবের শাসনকালের অবসান থেকে

তুকারাম মহারাজ

শিবাজীর সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত এই দীর্ঘ অন্ধকার যুগে এই সমস্ত ভক্ত-কবিই মহারাষ্ট্রের সমাজকে নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতি আঁকড়ে থাকার শক্তি যুগিয়েছেন। সমাজকে পথভ্রষ্ট বিচ্ছিন্ন হতে দেননি।

তবে শ্রীকৃষ্ণের এই বিচিত্র রূপ, ইটের উপর দণ্ডায়মান বিঠ্ঠল বা বিঠোবার কাহিনির সূত্রপাত আরও বহু পূর্বের। কোনো এক সুদীর্ঘ প্রাচীনকালের। আবার এই বিঠ্ঠলেরই অপর নাম পাণ্ডুরঙ্গ। 'পাণ্ডুরঙ্গ মাহাত্ম্য' নামক গ্রন্থ অনুযায়ী বহু পূর্বে পুণ্ডলীক নামে এক মুনি তাঁর মাতাপিতার সেবাযত্ন এতটাই নিষ্ঠা সহকারে করতেন যে তাঁর গল্প নারদ মুনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে শুনিয়েছিলেন। গল্প শুনে কৌতূহলী হয়ে এই অতুলনীয় পিতৃমাতৃভক্তি স্বচক্ষে দেখতে শ্রীকৃষ্ণ পুণ্ডলীকের গৃহে এসে

সন্ত নামদেব

উপস্থিত হয়ে ঘরের উঠানে দাঁড়িয়ে পুণ্ডলীকের নাম ধরে ডাকেন। কিন্তু পুণ্ডলীক তখন পিতামাতার সেবায় ব্যস্ত ছিলেন, তিনি অতিথিকে একটি ইট পেতে দিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে বলেন। অতিথিও ইটের উপর দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দিয়ে ধৈর্য ধরে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে লাগলেন। আজও বিঠোবা বা বিঠ্ঠল বা পাণ্ডুরঙ্গ ঠিক এইভাবেই পন্ধরপুরের মন্দিরে দাঁড়িয়ে আছেন।

১২৭৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন মহারাষ্ট্রের ভক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ জ্ঞানেশ্বর বা জ্ঞানদাস। এই জ্ঞানেশ্বরই 'ভাবার্থ দীপিকা' নামে গীতার ব্যাখ্যা সহজ সরল মারাঠি ভাষায় রচনা করেন। এই গীতার ব্যাখ্যা সাধারণভাবে 'জ্ঞানেশ্বরী' নামে খ্যাত। গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা মারাঠি ভাষায় প্রথমবার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছয়।

কিংবদন্তী অনুযায়ী, জ্ঞানেশ্বর মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে এই 'জ্ঞানেশ্বরী' রচনা করেন। এছাড়াও তিনি 'অমৃতানুভব' নামে দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ এবং অজস্র অভঙ্গ (মারাঠি ভক্ত পদাবলী) রচনা করেন। মারাঠি ভাষার বিকাশে এবং মহারাষ্ট্রের সংস্কৃতি নির্মাণের ক্ষেত্রে 'জ্ঞানেশ্বরী'কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়। মহারাষ্ট্রের জনজীবনে আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে এবং বিপুল রচনাসম্ভারসম্পন্ন করে মাত্র একুশ বছর বয়সে জ্ঞানেশ্বর পুনের কাছে আলন্দিতে স্বেচ্ছায় মহাসমাধিতে প্রবেশ করেন। আলন্দিতে তাঁর সমাধিমন্দির আজও সমগ্র মহারাষ্ট্রের তীর্থক্ষেত্র। জ্ঞানেশ্বরের দুই ভাই ও এক বোন যথাক্রমে নিবৃত্তিনাথ, সোপান ও মুক্তাবাঈ— এঁরা সকলেই আধ্যাত্মিক আকাশের এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং মুক্তাবাঈ অসংখ্য সুন্দর অভঙ্গের রচয়িত্রী।

জ্ঞানেশ্বরের সমকালীন ছিলেন নামদেব। 'শিম্পি' বা দর্জির ঘরে তিনি ১২৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বলা হয় যে, বাল্যকালে নামদেবকে একদিন তাঁর মা দুধ ঢেলে বিঠ্ঠলকে নিবেদন করার জন্য প্রেরণ করেন। বালক নামদেবের কাতর প্রার্থনা শুনে বিঠ্ঠল মূর্তি থেকে বেরিয়ে এসে দুগ্ধপান করেন এবং খালি পাত্র হাতে নিয়ে নামদেব বিস্মিত মায়ের কাছে ফিরে যান। পরবর্তীকালে নামদেব জ্ঞানেশ্বরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন এবং তাঁরা একসঙ্গে উত্তর ভারতে তীর্থযাত্রায় যান। পঞ্চাশ বছর বয়সে নামদেব সমাধি গ্রহণ করেন এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী পন্ধরপুর মন্দিরের দ্বারে সিঁড়ির নীচে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তিনি মারাঠি ভাষার কয়েক সহস্র অভঙ্গের রচয়িতা, যা গত সাতশো' বছরের অধিক সময়কাল ধরে মহারাষ্ট্রের মানুষকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাছাড়া হিন্দিতেও তিনি বহু পদ রচনা করেন যার মধ্যে আশিটি 'গুরু গ্রন্থসাহিব'-এ অন্তর্ভুক্ত। মহারাষ্ট্রের গণ্ডী ছাড়িয়ে তাঁর জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য বহন করে পঞ্জাবের হোশিয়ারপুরে তাঁর নামাঙ্কিত একটি মন্দির আজও বিদ্যমান।

জ্ঞানেশ্বরের জ্ঞানেশ্বরীতে দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রদেবের উল্লেখ আছে। তাঁকে পন্ধরপুরের ভক্ত এবং বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানেশ্বরের মহাসমাধির সমকালেই মহারাষ্ট্রের স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ জনজীবনের ওপর আঘাত হানে ভয়াবহ বিদেশি আক্রমণ। আট হাজারের সৈন্যবাহিনী নিয়ে দিল্লি থেকে আলাউদ্দিন খিলজি ১২৯৪ সালে অতর্কিতে দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রদেবকে আক্রমণ করে। বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন লুণ্ঠন করে তিনি সে প্রত্যাবর্তন করে, কিন্তু ১৩০৬ সালে পুনরায় মালিক কাফুরের নেতৃত্বে ৩০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করে এবং রামচন্দ্রদেবকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। ১৩১৩ সালে আবার মালিক কাফুর আক্রমণ করে এবং রামচন্দ্রের পুত্র শঙ্করদেবকে পরাজিত ও নিহত করে। এই সময় থেকে শুরু করে সপ্তদশ শতাব্দীতে শিবাজীর সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত মহারাষ্ট্র তার ধর্ম-সংস্কৃতি, নিজস্ব জীবনধারণ পদ্ধতিকে সংকটের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সাহসের সঙ্গে মোকাবিলা করে। তমসাচ্ছন্ন এই বিপদ্‌কালে পন্ধরপুরের বিঠ্ঠলকে কেন্দ্র করে এই ভক্তি আন্দোলন

একদিকে সমগ্র মহারাষ্ট্রবাসীকে একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রদান করে জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে এবং বর্ণ-জাতি-শ্রেণীগত প্রাচীরগুলি অতিক্রম করে মহারাষ্ট্রের হিন্দু সমাজকে একটি সংহত রূপ প্রদান করে।

মধ্যযুগীয় মহারাষ্ট্রের সমাজ প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত— উচ্চবর্ণ অর্থাৎ মূলত ব্রাহ্মণ জাতি, শূদ্রবর্ণ অর্থাৎ মূলত কুন্‌বি বা কৃষককুল ও অতি-শূদ্র অর্থাৎ মাহার, মাং প্রভৃতি তথাকথিত 'অস্পৃশ্য' জাতি। উল্লেখযোগ্যভাবে, মহারাষ্ট্রের এই বিঠ্‌ঠল সম্প্রদায়ের সন্তরা সমাজের এই তিনটি অংশ থেকেই এসেছিলেন। জ্ঞানেশ্বর, ভানুদাস, একনাথ ব্রাহ্মণ ছিলেন, নামদেব শিম্পি বা দর্জি জাতি, তুকারাম শূদ্র কুন্‌বি, সাঁতা ছিলেন মালি জাতি, নরহরি ছিলেন সোনার বা স্বর্ণকার জাতি, গোরা এবং রাকা ছিলেন কুম্ভার বা কুম্ভকার জাতি, সেনা ছিলেন নাপিত জাতি, চোখামেলা ছিলেন মাহার বা তথাকথিত 'অস্পৃশ্য' জাতি, জনাবাঈ ছিলেন ঝি এবং কান্‌হোপাত্রা ছিলেন নর্তকী। এর মধ্যে যেমন আমরা সমগ্র সমাজের একটা চিত্র পাই, তেমনই সামাজিক অসাম্য সত্ত্বেও ভক্তির জগতে জাতি-বর্ণ-জন্ম নির্বিশেষে আধ্যাত্মিক সাম্যের তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ দেখতে পাই।

ওয়ারকরী সম্প্রদায়ের ভক্ত কবিদের এই জাতিগত ও পেশাগত বৈচিত্র্য থেকে আরেকটি সামাজিক দিক আমরা লক্ষ্য করতে পারি— জ্ঞানেশ্বর ব্যতীত এই আন্দোলনের প্রায় সকলেই সংসারি ছিলেন। নামদেব, একনাথ, তুকারাম-সহ সকলেই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে আর পাঁচটা লোকের মতোই পূর্ণমাত্রায় সংসার করেছেন। যদিও অবশ্য এঁদের প্রায় সকলকেই বিঠ্‌ঠল-প্রেমে পাগল হয়ে সংসারের অবহেলার জন্য সহধর্মিণীদের বিদ্রূপও সইতে হয়েছে।

এই আন্দোলনের জাতিগত বৈচিত্র্যের সঙ্গে আরেকটি বৈশিষ্ট্যও আমরা লক্ষ্য করতে পারি— দর্জি, নাপিত, মালি, কুম্ভকার ও মুদির মতো অতি সাধারণ পেশায় নিযুক্ত মানুষেরা এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন এবং সমাজে উচ্চকোটির সাধক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তাঁদের দৈনন্দিন কর্ম ও তাঁদের সাধনা যেন মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। যাঁর অভঙ্গ দিয়ে আমরা এই প্রবন্ধ শুরু করেছিলাম, সেই সাঁওতা মালি তাঁর বাগানে নিত্যদিনের কাজের মধ্যেই ঈশ্বরের দেখা পান। বলা হয় যে, একদিন সাঁওতার বাগানের সামনে দিয়ে জ্ঞানেশ্বর ও নামদেব-সহ স্বয়ং পাণ্ডুরঙ্গ যাচ্ছিলেন। সাঁওতার উথলে

সন্ত জ্ঞানেশ্বর

ওঠা ভক্তির স্রোত প্রভুকে স্পর্শ করে এবং তিনি উদ্যানে প্রবেশ করে সাঁওতাকে আলিঙ্গন করেন ও তাঁর সেবা গ্রহণ করেন। সাঁওতার ভাষায়, তাঁর বাগানে জলের স্রোত, কুঁয়ো, দড়ি এবং জলের পাত্র পন্ধরী বা পন্ধরপুরের নাথেই নিমজ্জিত। ঝি জনাবাঈ পাণ্ডুরঙ্গের নামকীর্তন করতে করতে যখন ঘরের কাজ করতেন, তখন প্রভু স্বয়ং এসে তাঁর কাজে সাহায্য করতেন। জনাবাঈয়ের ঘর মোছার সময় প্রভু আবর্জনা বাইরে ফেলে দিতেন, জনা গম ঝাড়লে প্রভু বাছাই করে দিতেন। ভক্ত নাপিত সেনা ধ্যানে মগ্ন থাকায় রাজার আদেশ সত্ত্বেও দাড়ি কামাতে যেতে পারেননি। তাঁকে রাজরোষ থেকে বাঁচাতে স্বয়ং প্রভু সেনার বেশ ধারণ করে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হলেন। কাজ শুরুর কিছুক্ষণ পর সামনে রাখা তৈলপাত্রে রাজা নাপিতের প্রতিবিম্ব দেখে কেঁপে ওঠেন। পিছনে ফিরে দেখেন তাঁর চিরকালের নাপিত সেনাই রয়েছেন। আশ্বস্ত হয়ে সামনে ফিরতেই আবার সেই প্রতিবিম্ব— শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছেন।

গোরা কুম্ভকার বা মাহার চোখামেলার জীবনের সঙ্গেও এরকম অজস্র অলৌকিক কাহিনি সম্পৃক্ত রয়েছে। 'অস্পৃশ্য' চোখামেলার সম্পূর্ণ পরিবারই ছিল বিঠ্‌ঠলের ভক্তিতে নিমগ্ন। তাঁর স্ত্রী সোয়ারাবাঈ, পুত্র কর্মমেলা, ভগিনী নির্মলা এবং ভগ্নিপতি বাম্‌কা— এই পরিবার দ্বারা রচিত বহু অভঙ্গ আজও মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে গীত হয়। দুঃখের বিষয়, 'অস্পৃশ্য'

জাতিতে জন্মগ্রহণের জন্য তাঁর ইষ্টদেব বিঠ্ঠলের মন্দিরে তাঁর প্রবেশাধিকার ছিল না এবং মন্দির-দ্বারে দাঁড়িয়েই তাঁকে ভক্তি নিবেদন করতে হোত। কথিত আছে, একবার বিঠ্ঠল নিজে তাঁর গৃহে ঢুকে তাঁর হাত ধরে টেনে তাঁকে মন্দিরের গর্ভগৃহে নিয়ে যান। কিন্তু এরপরও মন্দিরের পুরোহিতরা তাঁকে প্রবেশাধিকার দেননি। কিংবদন্তী বলে যে, একটি নির্মিয়মান প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ে চোখা-সহ একদল মাহারের মৃত্যু হয়। তাদের দেহগুলি এমনভাবে পিষ্ট হয়ে যায় যে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। এই সমস্যার কথা শুনে নামদেব বললেন, যে অস্তিগুলি থেকে অবিরাম 'বিঠ্ঠল, বিঠ্ঠল' ধ্বনি শোনা যাবে সেগুলি চোখামেলার। এই পদ্ধতিতে চিহ্নিত করে মন্দিরের প্রধান দ্বারেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় এবং এই সমাধি আজও বিদ্যমান।

জ্ঞানেশ্বর-নামদেব-চোখার সঙ্গে মহারাষ্ট্রের ভক্তি আন্দোলনের একটি পর্ব সমাপ্ত হয়। এরপর দুই শতাব্দী ধরে মহারাষ্ট্রীয় সমাজকে বৈদেশিক আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে হয়। চতুর্দশ শতকে দিল্লির সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক রাজধানী স্থানান্তরিত করেন মহারাষ্ট্রের ভূতপূর্ব হিন্দু শাসকদের রাজধানী দেবগিরিতে। দেবগিরির তিনি নতুন নামকরণ করেন দৌলতাবাদ। যদিও এই স্থানান্তরকরণ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কিন্তু মহারাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে ইসলামিক সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে। এই সংকটের সময় সৃজনশীলতা কমে যায় এবং কোনো উল্লেখযোগ্য নতুন সৃষ্টি চোখে পড়ে না। রাজনৈতিক জগতে দিল্লি সুলতানি ভেঙে যায় এবং দাক্ষিণাত্যে বাহমনি সুলতানি গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে বাহমনি সুলতানি ভেঙে পাঁচটি স্বাধীন মুসলমান সুলতানি তৈরি হয়। অপরদিকে হিন্দু বিজয়নগর সাম্রাজ্যও প্রতিষ্ঠা হয়। এই ভাঙাগড়ার মাঝে ষোড়শ শতাব্দীতে আবার যেন হিন্দু সমাজ তার স্বাভাবিক ছন্দে এবং সৃষ্টিশীলতায় ফিরে আসতে পারে। ১৫৩৩ সালে মহারাষ্ট্রের ভক্তি আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায় শুরু হয় একনাথের জন্মগ্রহণের সঙ্গে।

প্রতিষ্ঠান বা পৈঠান নামক শহরে জন্মগ্রহণ করে একনাথ ভাগবত ধর্মের প্রচারের দ্বারা ষোড়শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক ও সাহিত্যিক বিকাশ ঘটান। তিনি ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মগ্রহণ করেও সামাজিক একতার বাণী প্রচার করেন ও ব্যক্তিগত আচরণ দ্বারা অস্পৃশ্যতার মতো কুসংস্কার থেকে সমাজকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। তাঁর রচিত অভঙ্গেও সমাজের প্রান্তিক মানুষ যেমন শূদ্র অস্পৃশ্যদের কথা এবং সামাজিক সমতার কথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন। ধর্মীয় প্রচারে মাতৃভাষার ব্যবহারের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন এবং এই উভয় কারণে পণ্ডিত সমাজের আক্রমণের মুখে তাঁকে বার বার পড়তে হয়। মারাঠি সাহিত্যের ইতিহাসেও একনাথের রচনা একটি নতুন যুগের সূচনা করে। তিনি 'ভাবার্থ রামায়ণ' নামে মারাঠি ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করেন এবং মারাঠিতে ভাগবতের টীকা রচনা করেন। বলা হয় যে, এই নিয়ে বিতর্ক উঠতে তাঁকে কাশীতে ডেকে পাঠানো হয় এবং আত্মরক্ষায় তিনি বলেন, ভাগবতের মতো পবিত্র ও সুন্দর রচনা সংস্কৃত ভাষায় সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে হওয়াতে তিনি তার সৌন্দর্য ও মহত্ব মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য এই ভাষার ব্যবহার করেন। সহজ সরল মারাঠি ভাষা ব্যবহারের জন্য তাঁর হরিসভার আসরে ভিড় ছিল দেখার মতো।

কিংবদন্তী বলে যে, জনৈক রামু মাহারের নিমন্ত্রণ রক্ষায় তিনি তাঁর বাড়ি গিয়ে সেখানে তাঁর হাতে খাদ্য গ্রহণ করেন। বাইরে থেকে পণ্ডিতসমাজ এই ঘটনা দেখে একনাথকে সমাজচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত জানাতে একনাথের গৃহে গিয়ে দেখেন সেখানে তিনি আসরে বসে ভাগবতের ব্যাখ্যা শোনাচ্ছেন। বিভ্রান্ত হয়ে আবার ফিরে গিয়ে দেখেন রামুর বাড়িতে একনাথ তখনও বসে আহার করছেন। বলা হয় যে, সামাজিক রোষের হাত থেকে প্রিয় ভক্তকে রক্ষা করতে বিঠ্ঠল নিজেই একনাথের রূপ ধারণ করে ভাগবত ব্যাখ্যা করছিলেন।

একনাথের রচনাগুলির মধ্যে আমরা একদিকে কর্ম এবং বৈরাগ্য, অপরদিকে আত্মকেন্দ্রিক সাধনা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার সমন্বয় দেখতে পাই। তাঁর ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বিদায়কালে উদ্ধবকে উপদেশ দিচ্ছেন মানুষের কল্যাণার্থে স্বধর্মের পালন করতে। সেখান 'লোকসংগ্রহ' বা মানুষের কল্যাণ চিন্তার কথা একনাথ উপস্থাপন করেছেন।

মুসলমান রাজ-ক্ষমতার হাতে হিন্দুদের শোচনীয় অবস্থার কথাও একনাথ উল্লেখ করেছেন। একনাথী ভাগবতে তিনি সমকালীন পরিস্থিতির কথা বলেছেন, 'আমাদের গো-ধন এবং ব্রাহ্মণগণ অত্যাচারিত। বিধর্মীরা আমাদের ক্ষেত, আমাদের সম্পত্তি এবং আমাদের নারীদের উপর থাবা বসায়' (একনাথী ভাগবৎ, ১০-৫-৫৮৮)। এই পরিস্থিতিতে একনাথ মানুষের সামনে গোব্রাহ্মণ প্রতিপালক রামচন্দ্রের আদর্শকে তুলে ধরেন মারাঠি ভাষায় রচিত তাঁর 'ভাবার্থ রামায়ণ'-এর মাধ্যমে। 'ভাবার্থ রামায়ণ'-এ ব্রাহ্মণকুলকে সম্বোধন করে একনাথ দ্বারা অঙ্কিত শ্রীরামচন্দ্র বলছেন, 'গোব্রাহ্মণ রক্ষাই আমার স্বধর্ম।

আমি উপস্থিত থাকতে, ভয়ের কারণ কী? আমি বাণ নিক্ষেপ করে মেরুপর্বত দুই খণ্ডে ভাগ করে অসুরকুল ধ্বংস করব। রঘুবীর যখন আপনাদের সেবক তখন ভয় কীসের?' (ভাবার্থ রামায়ণ, ক, ১-৫০,৫১)।

এই 'ভাবার্থ রামায়ণ'-এ তিনি মারাঠি কাব্যে বীররসের প্রবর্তন করেন। এর ফলে মারাঠি ভক্তি সাহিত্যে খোল করতালের মধুর শব্দের সঙ্গে অস্ত্রের ঝঙ্কারও শোনা যেতে শুরু করে। 'রঘুনন্দন গুরুকে প্রণাম নিবেদন করলেন। ধনুক হাতে তিনি প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন। রামের কঠোর মুখভঙ্গি দেখে স্বয়ং মৃত্যুও ভয়ে কম্পিত হয়। রামের মুখমণ্ডলে বীরত্ব ও সাহস। বাণের শব্দে মেরু ও মন্দার পর্বত কেঁপে ওঠে, সপ্ত সমুদ্রে জোয়ার আসে, তিরের ছন্দে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নেচে ওঠে। বৈকুণ্ঠে ছড়ায় আনন্দের লহরী।' (ভাবার্থ রামায়ণ, খ, ১২-১০৭-১১)।

একনাথ সংসার ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক সাধনার তথাকথিত বিভেদকে আক্রমণ করেন। ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করাই মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য অথচ সমাজ-সংসারের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা তিনি বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন।

১৫৯৯ খৃস্টাব্দে একনাথ পরলোকগমন করেন এবং তার কয়েক বছর পরেই ১৬০৮ সালে পুনের নিকট দেহু গ্রামে শূদ্র পরিবারে তুকারামের জন্ম হয়। ১৬৩০ সালে মহারাষ্ট্রে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে তুকারামের প্রথমা স্ত্রী রামুরাঈ এবং পুত্র সন্তুর জীবনাবসান হয়। অর্থনৈতিকভাবেও তিনি নিঃস্ব হয়ে পড়েন। অন্তর্মুখী হয়ে তুকারাম বিঠ্ঠলের আরাধনায় দিনযাপন করেন। স্বপ্নদীক্ষা লাভ করার পর তিনি অভঙ্গ রচনা করে কীর্তনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভাগবত ধর্মের প্রচার করেন। তাঁর অভঙ্গের মাধ্যমে তিনি তৎকালীন সামাজিক চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তৎকালীন পণ্ডিত সমাজের অহঙ্কার, শূদ্রদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা এবং দ্বিচারিতাকে তিনি সরাসরি আক্রমণ করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই পণ্ডিতসমাজ রুষ্ট হয়ে তাঁর অভঙ্গগুলিকে শাস্ত্রবিরোধী আখ্যা দিয়ে নদীর জলে নিক্ষেপ করার আদেশ দেয়। বাধ্য হয়ে তুকা তাঁর সমস্ত রচনাগুলিকে কাপড়ে মুড়ে পাথর বেঁধে ইন্দ্রায়নী নদীতে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু তুকা মনে করেন যে, ঈশ্বর যদি তাঁর রচনাগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন তবে তিনি সেগুলিকে রক্ষা করবেন। আর তুকার নিবেদন গুরুত্বহীন মনে করে যদি প্রস্তরমূর্তির মধ্যেই নিজেকে লুকিয়ে রাখেন তবে তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করবেন। নদীর তীরে তুকা অনশনে বসেন এবং তাঁর পরিবার ও অনুগামী-সহ অবিরত কীর্তনে বিঠ্ঠল

জিজাবাঈ

পাণ্ডরঙ্গকে ডাকতে থাকেন। কথিত আছে, ত্রয়োদশ দিবসে অলৌকিকভাবে তাঁর নিক্ষিপ্ত লেখাগুলি ঘাটে ভেসে ওঠে। কিন্তু এই ঘটনা সত্ত্বেও তাঁর ওপর আক্রমণের অবসান হয়নি।

উল্লেখযোগ্য, তুকারামের জীবনকালেই মহারাষ্ট্রে শিবাজীর উত্থান ঘটে। বলা হয়, শিবাজী তুকারামকে মূল্যবান উপহারসামগ্রী প্রেরণ করেছিলেন। অভাবের সংসারে উপহার পেয়ে দ্বিতীয়া স্ত্রী জিজাবাঈ আনন্দে আপ্লুত হন, কিন্তু সংসারের মায়ার প্রতি উদাসীন তুকারাম সমস্ত উপহার ফেরত পাঠিয়ে দেন। কথিত আছে, শিবাজী তুকারামের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন। মহারাষ্ট্রে কিংবদন্তী রয়েছে যে, শিবাজী একদা তুকার কীর্তন শুনতে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর খোঁজে আসা বিজাপুরী বাহিনী মন্দির চত্বর ঘিরে ফেলে। এই অবস্থায় তুকার প্রার্থনা শুনে বিঠ্ঠল স্বয়ং শিবাজীর রূপ ধারণ করে শত্রুপক্ষকে ভুলিয়ে সেই স্থান থেকে অনেক দূরে নিয়ে যান, যার ফলে আসল শিবাজী নিরাপদে প্রত্যাগমন করতে পারেন।

অবশ্য এই সমস্ত কিংবদন্তীর ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে তুকার সঙ্গে শিবাজীর সম্পর্ক ছিল এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাভাব ছিল। দুজনেই নিজের নিজের পথে ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ

SURYA STEELS

HIG - 969

P.H.B.C. Coloni

Jamalpur

Ludhiana - 141 010

Chander Bhan
Suraj Bhan

Phone : (O) 2461423, 3294291, (F) 2850492
Mob. 9319224997
Tele Fax : 2461423, (STD-0562)

AMAR MARKET,

JOHRI BAZAR, AGRA-3

Manufacturers of

All Kinds of Handloom,

Durries and Carpets etc.

SAHARA®

Air Coolers, Storage Water Heaters,
Exhaust Fans, Ceilling Fans, Fresh Air Fans,
Cooler Kit, Washing Machines, Heat Convectors

VIKAS ENGINEERS

Manufacturers of :

SAHARA Electrical Appliances

D-377/378, Sector-10, NOIDA-201301
Ph.:0120-2520297, 2558594
Telefax : 0120-2526961
Website : www.saharaappliancesindia.com

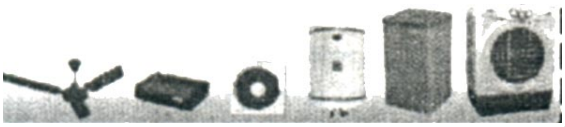

011-32306597
011-30306592

SRE

SNEH RAMAN
ELECTRICALS PVT. LTD.

E-12, Sector - XI, Noida -201 301,
Distt. Gautam Budh Nagar (U.P.)

Ph. : 91-0120-3090400, 91-0120-3090401,

Manufacturer :

Power Transformers ● Furnace Transformers ● Voltage Stabilizer-Manual/Servo ● D.C. Drive ● Control Panels HT/LT/Metering ● Distribution ● Automatic Starters upto 500 H.P. ● Turn Key Projects ● Electrical-Mechanical ● OrderSupplier● Traders (Heavy Electrical Repair's)

Regd. Office : W.Z. 3227, Mohindra Park, Shakur Basti, Rani Bagh, Delhi

করছিলেন। তুকারাম তাঁর অভঙ্গে বলেছেন, ধর্মকে রক্ষা করা, অধর্মের সঙ্গে সংঘাত করা এবং নামের মাহাত্ম্য প্রচার করাই তাঁর লক্ষ্য (তুকারামবাওয়াচ্যা অভঙ্গচি গাথা, ইন্দুমতি সংস্করণ, ২১৩৬)। 'ধর্ম রক্ষার জন্য আমরা সদা নিয়োজিত। আমরা বৈদিক পন্থার প্রচার করি ও সন্তদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করি।' (ঐ, ২৬০)। তুকার 'পাইকিচে অভঙ্গ' ('যোদ্ধার অভঙ্গ') নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করে। অনেকে মনে করেন যে তুকার অভঙ্গগুলি যে পুণে অঞ্চল সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল, সেই অঞ্চল থেকেই শিবাজীর সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ নিয়োগ হোত। তাদের মধ্যে নৈতিকতা এবং ধর্মপ্রতিষ্ঠার স্পৃহা ছড়িয়ে দিয়ে পরোক্ষভাবে মারাঠা জাতীয় অভ্যুত্থানে তুকার অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

১৬৫০ খৃস্টাব্দে প্রায় পাঁচ হাজার অভঙ্গের বিপুল রচনাসম্ভার রেখে তুকারাম পরলোগমন করেন। কিংবদন্তী বলে, ঈশ্বর তাঁকে সশরীরে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যান। তুকারাম মহারাষ্ট্রের ওয়ারকরী আন্দোলনকে নতুন মাত্রা প্রদান করেন, গ্রামে গঞ্জে প্রচুর মানুষ তাঁর ভক্ত হয় এবং ওয়ারকরীদের প্রধান উৎসব আষাঢ় একাদশীর জনপ্রিয়তা আরও ছড়িয়ে পড়ে।

তুকা বলে—
মধুর এই নাম
করো সর্বদা গুণগান
হরি, গোবিন্দ, কৃষ্ণ, রাম।
পুণ্য, উপবাস, তীর্থযাত্রা,
এই নামের সাগরে করো স্নান।।

মহারাষ্ট্রের জাতীয় জাগরণে সন্ত পরম্পরার ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বশেষ আলোচ্য সমর্থ গুরু রামদাস। রামদাসের সময়কাল ১৬০৮-১৬৮১। ছত্রপতি শিবাজীর গুরু রূপে রামদাস আমাদের কাছে পরিচিত। শিবাজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের এই জাতীয় জাগরণে এ যাবৎ আলোচিত সন্তদের ভূমিকা পরোক্ষ, কিন্তু রামদাসের ভূমিকা প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয়। বারো বছর বয়সে তিনি সংসার পরিত্যাগ করে নাসিকের কাছে একটি স্থানে কঠোর তপস্যায় বারো বছর অতিবাহিত করেন। তপস্যান্তে তিনি আরও বারো বছর সারা ভারতে বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করেন। শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত চতুর্মঠ এবং দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ তিনি দর্শন করেন। এই তীর্থ ভ্রমণকালে বিধর্মীদের সন্ত্রাসে হিন্দুদের শোচনীয় ও শঙ্কিত অবস্থা তাঁকে নাড়া দেয়।

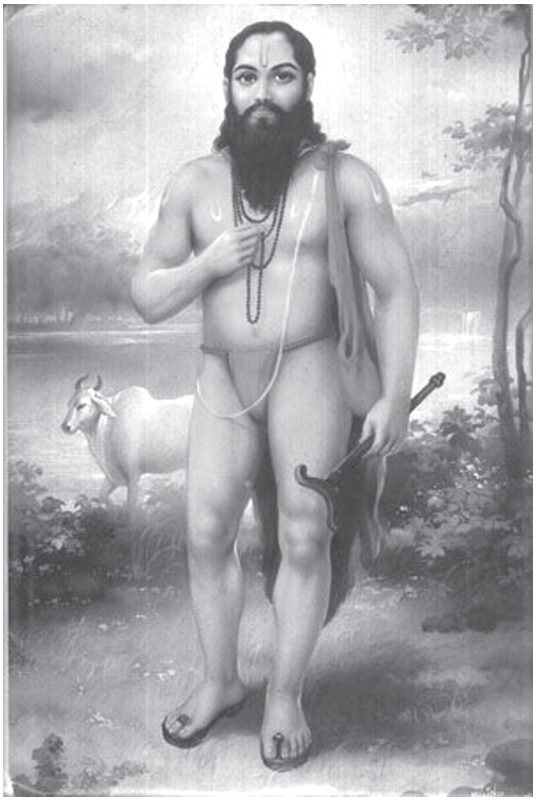

সন্ত রামদাস

তিনি দেখেন, সারা দেশে পবিত্র তীর্থস্থানগুলি হামলার ভয়ে তটস্থ, বলপূর্বক ধর্মান্তরণ দ্বারা ক্রমাগত হিন্দু সংখ্যা হ্রাস এবং সার্বিকভাবে হিন্দু ধর্মের অস্তিত্বের সংকট। তিনি উপলব্ধি করেন যে ন্যায় ও ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দুদের রাজক্ষমতা দখল ও রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করতে হবে। মহারাষ্ট্রে ফিরে তিনি তুকারাম-সহ অন্যান্য সন্তদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং অমানুষিক উদ্যম ও কর্মক্ষমতার দ্বারা তাঁর জাগরণের বাণী মহারাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যে শিরগাঁও ও চাফলে প্রধান দুটি মঠ-সহ মোট এগারোটি মঠ ও অসংখ্য মন্দির তিনি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে। অসংখ্য নরনারী ও সম্পূর্ণ পরিবার সংসার ত্যাগ করে তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে সম্পূর্ণভাবে এই নব আন্দোলনে নিজেদের নিয়োজিত করেন। এইভাবে রামদাসী সম্প্রদায়ের সূত্রপাত হয় যারা সমগ্র মহারাষ্ট্র ঘুরে শক্তি এবং প্রতিরোধের এই নতুন বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। করতালের পরিবর্তে তরবারিকেই রামদাস ভক্তি আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত করেন।

এই সময়েই শিবাজীও অনুরূপ আদর্শের জন্য সংগ্রামরত ছিলেন এবং মহারাষ্ট্রে হিন্দু জাগরণের এই দুই কাণ্ডারির মিলন অবশ্যম্ভাবী ছিল। ১৬৪৯ সালে রামদাস শিবাজীকে দীক্ষাদান

সন্ত একনাথ

করেন।

রামদাসের বাণী তাঁর 'দাসবোধ' নামক গ্রন্থে সমন্বিত। তাঁর রচনায় তিনি তৎকালীন ভারতে ইসলামিক সন্ত্রাস সম্বন্ধে স্পষ্টভাষী। একই সঙ্গে হিন্দু সমাজে সামাজিক অবক্ষয় এবং কুসংস্কারের তিনি ছিলেন বিরোধী। তিনি আদর্শ মানবের গুণাবলী আলোচনা করে কর্ম ও সাধনা উভয়কেই অপরিহার্য বলে মনে করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষের প্রথম কর্তব্য নিজের হৃদয়ে ঈশ্বরকে স্থাপনা করা এবং অতঃপর তার নিজের ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করা।

'দাসবোধ' ১৬৫৯ সালে লিখিত আর এই সময়ে শিবাজী বিজাপুরী সেনাপতি আফজল খাঁকে বধ করেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে শিবাজীর প্রতি রামদাসের পরামর্শ সংকলিত হয়েছে। ১৬৫৫ সালে শিবাজী তাঁর রাজত্ব রামদাসের চরণে গুরুদক্ষিণা-রূপে অর্পণ করেন। রামদাস অবশ্য তা গ্রহণ করেও রাজ্য পরিচালনার জন্য শিবাজীকে প্রত্যর্পণ করেন। ১৬৬১ সালে শিবাজী প্রতাপগড় দুর্গ নির্মাণের পর গুরু রামদাসের হস্তদ্বারা সেখানে তুলজা ভবানী দেবীর মূর্তি স্থাপিত করান। ১৬৭৪ সালে রাজ্যাভিষেকের পর শিবাজী রামদাসের সঙ্গে সজ্জনগড়ে প্রায় দেড় মাস অবস্থান করেন। ১৬৮০ সালে শিবাজীর মৃত্যুর এক বছর পরই ১৬৮১ সালে রামদাস দেহত্যাগ করেন। একে অপরের কাজে প্রেরিত পত্রাবলীতে গুরু-শিষ্যের এই গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কথা আমরা জানতে পারি। শিবাজীকে প্রেরিত একটি পত্রে রামদাস লিখেছেন, 'মহারাষ্ট্র ধর্ম রহিলা কাহি তুম্হা কারণে।' (মহারাষ্ট্র ধর্মের অস্তিত্ব বজায় থাকল তোমার কারণে)।

রামদাসের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পর তাঁর এক প্রশিষ্য গিরিধর প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান থেকে 'সমর্থ প্রতাপ' নামে রামদাসের জীবনী রচনা করেন। এই লেখা থেকেই রামদাস ও শিবাজীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের চিত্র আমরা পাই। অষ্টাদশ শতকে মহিপতি (১৭১৫-১৭৯০) তাঁর 'ভক্তবিজয়', 'ভক্ত লীলামৃত', 'সন্ত লীলামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থে মহারাষ্ট্রের এই সমস্ত ভক্ত-সাধকের জীবনী ও তাঁদের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার বিবরণাবলী গ্রন্থভুক্ত করেন। মহিপতির 'ভক্তবিজয়' এবং অন্যান্য গ্রন্থ থেকেই প্রধানত আমরা আজ এই ভক্তদের বিষয়ে জানতে পারি। এই ভক্ত-কবিদের রচিত অভঙ্গমালা আজও মহারাষ্ট্রে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং আষাঢ় একাদশীর ওয়ারকরী তীর্থযাত্রা মহারাষ্ট্রের জনজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ ইরাবতী কারওয়ে একবার মহারাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এই বলে যে, মহারাষ্ট্র হচ্ছে সেই ভূমি যেখানকার মানুষেরা তীর্থযাত্রা করতে পন্ধরপুর যায় ('the land whose people go to Pandharpur for pilgrimage')।

যদিও জ্ঞানেশ্বর থেকে তুকারাম এই ভাগবত সম্প্রদায়ের সাধকদের শান্ত সহিষ্ণু স্বভাব এবং রামদাসের জয়িষ্ণু অস্ত্রধারণের আহ্বানকে অনেক সময় বৈপরীত্যের আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয় কিন্তু বাস্তবে এই দুই প্রবৃত্তি একে অপরের পরিপূরক। ভাগবত সম্প্রদায়ের পরম্পরা মহারাষ্ট্রবাসীকে নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে, তাদের মধ্যে নিজেদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্বন্ধে সচেতনতা তৈরি করে জাতপাতের বিভেদ অনেকাংশে দূর করে সামাজিক সংহতি নির্মাণ করে এবং সর্বোপরি বেদ-উপনিষদের উচ্চমার্গের দার্শনিক তত্ত্বকে ভক্তিমূলক অভঙ্গের রূপে সাধারণ মারাঠি ভাষায় সমাজের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেন। এর ফলে 'অস্পৃশ্য' মাহারদের থেকে শুরু করে সমাজের প্রান্তিক জাতি ও পেশার মানুষেরাও এই ধর্মীয়ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনে সক্ষম হয়। এই সুদৃঢ় সামাজিক ভিতের উপরেই রামদাস-শিবাজী জাতীয় ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় 'স্বাধীন হিন্দবী স্বরাজ'-এর নির্মাণ করতে পারেন, যা পরবর্তীকালে পেশোয়া শাসনকালে সমগ্র ভারতে 'হিন্দু পদ পাদশাহী'তে রূপান্তরিত হয়।

পুরাতত্ত্ব বিভাগের খননে কাবেরীর বালি থেকে প্রাপ্ত কৃষ্ণনারায়ণ মন্দির।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এক স্থাপত্য তালকাড

সৌমেন নিয়োগী

অখিল ভারতীয় ইতিহাস সংকলন যোজনার ১০ম সম্মেলন উপলক্ষে আমরা কর্ণাটকের মহীশূরে উপস্থিত হই। তিনদিন ব্যাপী এক সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক আলোচনচক্রে যোগ দিতে। ইতিহাস তো কেবল শুধুই আলোচনাচক্রে যোগদান বা ভিন্নমত ও নতুন তথ্য সংগ্রহ নয়, বরং বৃহদ ভারতীয় ভূখন্ডের ভৌগোলিক ও ভূ-বৈচিত্র্যের পটভূমিকায় রচিত ভারতবর্ষের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ স্থাপত্যকে চাক্ষুষ করা ও তার বিশিষ্টতাকে অনুভব করা। সৌভাগ্যক্রমে দেখার সুযোগ হলো পর্যটন মানচিত্রে স্বল্প পরিচিত স্থান অথচ অনবদ্য শিল্পকলা ও আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য, মহীশূর থেকে ৪৫ কিমি দূরে অবস্থিত তালকাড। কাবেরী নদীর বাম তীরে অবস্থিত কাবেরীর বালিতে নিমজ্জিত, এ এস আই খনন কার্যের দ্বারা উন্মোচিত, দক্ষিণ ভারতের গঙ্গা-চোল ও হোয়সল রাজত্বের স্মৃতিবিজড়িত নানা কিংবদন্তী মন্দিরে সমৃদ্ধ, 'পঞ্চলিঙ্গম্' দর্শন -মাহাত্ম্যে পূজিত এক জনপদ।

ইতিহাসের রাজন্যবর্গের ক্রমবর্ধমান অধ্যায়ের আগে বহু ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, কোনো স্থান নামকরণের পিছনে জড়িয়ে থাকে কোনো না কেনো পৌরাণিক, স্থানীয় ধর্মীয় উপকথা। সেইরকম 'তালকাড' নামকরণ দুই কিরাত ভ্রাতৃদ্বয় 'তাল' ও 'কাডুর' থেকে উৎপন্ন, বৈদ্যেশ্বর ভগবান শিবের দ্বারা অমরত্ব প্রাপ্ত বৈদ্যেশ্বর শিব মন্দিরের দুই দ্বারপাল, যারা জঙ্গলবেষ্টিত এই স্থানে প্রত্যক্ষ করেন ভগবান আশুতোষের মহিমা। পরবর্তীকালে জনশ্রুতি থেকে জানা যায়, ২৪৭-২৬৬ খৃস্টাব্দে গঙ্গারাজদের প্রথমপুরুষ হরিবর্মা এই স্থানটিকে দলবনপুর নামে অভিহিত করেন ও তাঁর রাজত্বের রাজধানী স্থাপন করেন। ক্রমে ১১শতকে চোলরাজারা জয় করলে নামকরণ হয় রাজারাজাপুরা এবং তার একশো বছর পর হোয়সলারাজ বিষ্ণুবর্ধন তালকাড জয় করেন এবং ৭টি নগর ও ৫টি মঠ নির্মাণ করেন। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অধীনে ১৪শতকে নামকরণ হয় সোমরাজা। ১৬১০ খৃস্টাব্দে মহীশূর রাজ রঙ্গারায়া / তিরুমালা রাজার অধীনে আসে তালকাড। যিনি শ্রীরঙ্গপত্তনমের বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি ছিলেন। এমনই এক সময় রাজা রঙ্গারায়া এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন ও তাঁর আরোগ্যের জন্য তালকাডের বৈদ্যেশ্বর

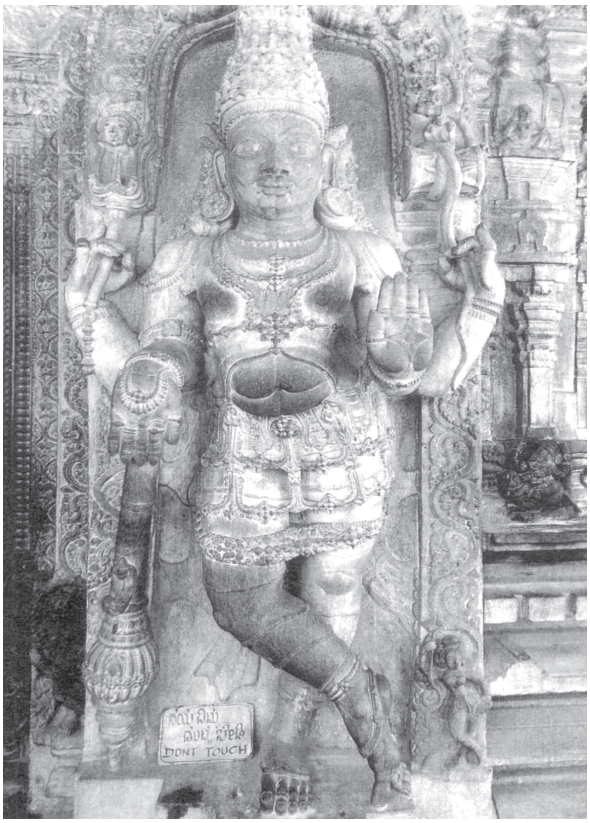

বৈদ্যেশ্বর শিব মন্দিরের প্রবেশ পথের দ্বারপাল।

শিব স্থানের উদ্দেশে রওনা হন। স্বামীর এই অবস্থায় তাঁর পাশে থাকার জন্য রানি আলাখেল্মা, মহীশূর রাজ রাজা ওয়াদিরকে গভর্নর নিযুক্ত করে তালকাডের উদ্দেশে রওনা হন। ওদিয়ার রাজা রানির গহনা ও সম্পত্তির লোভে সৈন্য পাঠালে, রানি আলখেল্মা মালেঙ্গীর কাছে কাবেরীর জলে নিজেকে আত্মাহুতি দেন তিন তিনটি অভিসম্পাত করে—

১) তালকাড কাবেরীর বালিতে নিমজ্জিত হবে।

২) মালঙ্গী ঘূর্ণিতে রূপায়িত হবে।

৩) ওদিয়া বংশে উত্তরাধিকার জন্মাবে না।

রানির এই অভিশাপই তালকাডের শাপ বলে পরবর্তী লোককথায় প্রচলিত। যখন প্রাকৃতিক কারণে কাবেরীর বালির তলে তলিয়ে যায় তালকাডের মন্দির এবং সত্যই ওদিয়ার রাজবংশের উত্তরাধিকার পেতে কষ্ট করতে হয় ১৭ শতকের ঠিক পরবর্তী সময় থেকে। এ এস আই-এর দ্বারা সংরক্ষিত ও উন্মোচিত মন্দিরগুলি হল (১) পাতালেশ্বর ও মারলেশ্বর, গঙ্গারাজ রাচ্যমল্লসত্যরক্ষ (৯৭৫-০৮৬)। মন্দিরের অধিষ্ঠান, গর্ভগৃহ ও অর্ধমণ্ডপ সবই গঙ্গাস্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য বর্তমান রয়েছে। কাবেরীর বালির মধ্যে থেকে মন্দিরটি পুনরুদ্ধার এবং রক্ষণ এ এস আই-এর কৃতিত্বের দাবি রাখে। তালকাডের মন্দিরগুলির ভাস্কর্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বৈদ্যেশ্বর শিবের মন্দির। যে মন্দিরে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজবংশের স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন বর্তমান। যেমন গঙ্গা— চোলা-হোয়সল রাজবংশ। পঞ্চলিঙ্গ দর্শনস্থলের অন্যতম এই শিবলিঙ্গ চিকিৎসক অর্থাৎ বৈদ্য রূপে স্থানীয় মাহাত্ম্যে পূজিত সেই তাল ও কাডু ভ্রাতৃদ্বয়ের সময় থেকে। দ্রাবিড় শৈলীতে নির্মিত, উত্তর ও দক্ষিণের মেলবন্ধনের বেসারাশিখর বিশিষ্ট, বিরাট জগতের উপর নির্মিত। মন্দিরের অর্ধমণ্ডপ ছয় পিলারবিশিষ্ট হোয়সলস্থাপত্যে নির্মিত। গর্ভগৃহকে সংযোজিত করেছে দুটি পূর্ব পশ্চিমমুখী মুখমণ্ডপের দ্বারা। মন্দির প্রবেশদ্বারে রয়েছে দুই মিটার উচ্চতার দুই দ্বারপাল ভ্রাতৃদ্বয় তালা ও কাডু। তাদের ভাস্কর্যের বৈশিষ্টতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তা হল এদের বক্ষ ও উদরদেশ মহাদেবের বাহন নন্দী বৃষভের মুখশ্রীর সঙ্গে অনুরূপ সাদৃশ্য। মন্দিরের বাইরের অলিন্দের ছাদের এক কোণে রয়েছে একক পাথর অর্থাৎ পঞ্চনাগের এক শিখর, যা সে যুগের এক সুউচ্চ মানের প্রযুক্তির সাক্ষ্য বহন করে। হোয়সলরাজ বিষ্ণুবর্ধন চোলরাজদের উপর বিজয় স্বরূপ ১১১৭ খৃস্টাব্দে নির্মাণ করেন বেলুড়ের চেন্নাকেশব মন্দিরের আদলে কৃর্তি নারায়ণ মন্দির।

বৈষ্ণবাচার্য রামানুজ তাঁর কর্ণাটক (আদি নাম মেলনাড়ু) পরিভ্রমণের সময়কালে ৫টি পঞ্চনারায়ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করেন, যা পরবর্তীকালে হোয়সলরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ৫টি উল্লেখযোগ্য বিষ্ণু মন্দির রূপে স্থাপিত হয়। যার মধ্যে তালকাডের কৃর্তিনারায়ণ মন্দির অন্যতম। কাজেই শুধু শৈবতীর্থ পঞ্চলিঙ্গ নয়, রয়েছে বৈষ্ণব তীর্থ কৃর্তীনারায়ণ মন্দির। সম্পূর্ণ গ্রানাইট পাথরে নির্মিত, নক্ষত্রের আকৃতির স্বরূপ জগতীর উপর এককূট, বিমান বিশিষ্ট দ্রাবিড় শৈলীর মন্দির। সমগ্র কৃতিত্বের দাবিদার এ এস আই। কাবেরী বালির মধ্যে থেকে সমগ্র মন্দিরটিকে উন্মোচিত করার জন্য।

তালকাডের মারলেশ্বর শিবমন্দিরের সামনে রয়েছে মহীশূরের দেবী চামুণ্ডার ভগিনী মা চৌড়েশ্বরী সিংহবাহিনী দেবী রুদ্ররূপা সকল ভক্তের মনোকামনা নিবারণের জন্য। দর্শনে মেলে তীর্থের প্রকৃত সাফল্য।

বারো বছর অন্তর কার্তিক মাসের বিশেষ তিথিতে পাতালেশ্বর, মারলেশ্বর, অর্কেশ্বর, বৈদ্যেশ্বর ও মল্লিকার্জুন— এই পঞ্চলিঙ্গ দর্শন করে পুণ্যার্থীরা কাবেরী জলে শুচি স্নিগ্ধ হয়ে লাভ করেন পঞ্চলিঙ্গম দর্শনের আধ্যাত্মিক শক্তি। পরিশেষে এইটুকুই বলি, ভারতের অস্মিতা, আধ্যাত্মিকতা, ভূপ্রকৃতির বিচিত্রতার ডালিতে তালকাডের স্থান অনন্য।

কাপুরুষ-মহাপুরুষ ছবিতে চারুপ্রকাশ ঘোষ।

অবিস্মরণীয় কমেডিয়ানরা

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

চলচ্চিত্র ইতিহাসের সর্বকালীন বর্ণময় চরিত্র স্যার চার্লস স্পেন্সর চ্যাপলিনের এতবড় নামটি বিশ্বব্যাপী আবাল-বৃদ্ধ- বনিতা মোটেই এইভাবে মনে রাখেনি। সকলেই তাঁকে 'চার্লি' নামে আপন করে নিতে ভালবাসে। আর এই চার্লি নামটি উঠলেই মানুষের মুখাবয়বে অজান্তেই ফুটে ওঠে ক্ষণিক হাসির উদ্ভাস। ডাক্তারবাবুরা বলছেন, যে কোনো মানুষের পক্ষেই প্রাণ খুলে হাসতে পারাটা খুবই স্বাস্থ্যকর। একশো বছরেরও বেশি আগে চলচ্চিত্র উদ্ভাবনের প্রত্যুষ লগ্নে চার্লি চ্যাপলিন এই ডাক্তারি নির্দেশ জানতেন বলে মনে হয় না। তবে তিনি সেই ১৯১৪ সাল থেকেই ছোট ছোট গল্প বলার ঢঙে (পূর্ণ দৈর্ঘ্যের দি কিড, লাইম লাইট প্রভৃতি আলাদা) মানুষের জীবনের নানা তাৎক্ষণিক অসঙ্গতিকে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভাবে তাঁর অভিনীত ও পরিচালিত চলচ্চিত্রগুলিতে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর বিশ্ববন্দিত অভিনয় ক্ষমতার গুণে আজও সেগুলির ডি ভি ডি বিক্রি আকাশছোঁয়া। কিন্তু চার্লির উপস্থাপনার মূল ভিত্তি ছিল নির্মল হাস্যরস, কোনো খুন, জখম, রহস্য বা রোমহর্ষক কাহিনি নয়। আর সবচেয়ে অবাক করা ঘটনা সত্যজিৎ রায় বলেছেন, কালজয়ী এই হাস্যরসের নায়ক চলচ্চিত্রে কথা বলতে চাননি। শব্দের প্রয়োগ শুরু হয়ে গেলেও তাঁর ১৯৩১-এর City Light ছিল নির্বাক। সত্যজিৎ আরও জানাচ্ছেন, "Chaplin's words have never quite matched the eloquence of his pantomimes" । চার্লির সবাক ছবিগুলি তাঁর নির্বাক ছবিগুলির বাঙ্ময়তার কাছে ম্লান হয়ে গেছে।

বৃটিশ সিনেমা তৈরির প্রায় সঙ্গে

তুলসী চক্রবর্তী ও রাণীবালা দেবী (পরশ পাথর)।

ভানু ও জহর (ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিসটেন্ট)

চিন্ময় রায় ও জনৈকা অভিনেত্রী (বসন্ত বিলাপ)

অরণ্যের দিনরাত্রি ছবির শুটিং-এ (বাঁদিক থেকে) সত্যজিৎ রায়, রবি ঘোষ, শমিত ভঞ্জ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়।

সঙ্গেই আমাদের বাংলাতেও চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু হয়ে যায়। নিউ থিয়েটার্স সিনেমাকে শিল্পের মর্যাদা দিয়ে একের পর এক ছবি তৈরি শুরু করে। সেই আমলেও কিন্তু চলচ্চিত্রে কৌতুকাভিনেতা বা মজাদার চরিত্র তৈরি করার ভাল রেওয়াজ ছিল। আগে চ্যাপলিনের যে নির্বাক অভিনয়ের প্রতি পক্ষপাতের কথা বলেছি, সেটি করতে গেলে মুখমণ্ডলের পেশীগুলিকে অত্যন্ত কমনীয় রাখতে হয়। আর এমন কঠিন শরীরী অভিনয় করার মতো কৌতুক অভিনেতার সে সময়েও কোনো খামতি ছিল না। তবে তাঁরা কখনোই যোগ্য সমাদর পাননি। সে নিজেদের কর্মজীবনেও নয়, মৃত্যুপরবর্তী সময়েও বলার মতো কিছু নয়। এমনই কয়েকজন অসাধারণ শিল্পীর কথা আলোচনা করা যেতে পারে, যাঁরা আজীবন তাঁদের অভিনয়কলার মধ্যে দিয়ে আমাদের আনন্দ বিতরণ করে গেছেন। এঁদের এককথায় কমেডিয়ানই বলা হত।

নিউ থিয়েটার্সের জমানায় ফণী রায়, নবদ্বীপ হালদাররা কমিক রিলিফের কাজ করলেও প্রকৃতপক্ষে ১৯৩২ সালে তুলসী চক্রবর্তী এই অভিনয় ধারায় বড়সড় পরিবর্তন আনলেন। কোনো প্রথাগত অভিনয় প্রশিক্ষণ তাঁর ছিল না। একেবারে পেটের টানেই এসেছিলেন ছায়াছবিতে। সিনেমায় নামার আগে তিনি সার্কাস থেকে শুরু করে যাত্রাদলে হারমোনিয়াম বাজানোর পর হোটেলের বাসনপত্র ধোয়ার কাজেও লেগে পড়েছিলেন। সেই অবসরেই তিনি দেখেছিলেন বিচিত্র মানব চরিত্র। ১৯৬১ সালে মারা যাবার আগে পর্যন্ত দ্বিশতাধিক ছবিতে তিনি অভিনয় করে গেছেন। তাঁকে ছবিতে দেখলেই চকিতে হাস্যরোল উঠত প্রেক্ষাগৃহে। ওই আগে বলা খুবই স্বল্প সংলাপ থাকত তাঁর। কিন্তু শুধু মুখে ও শরীরে নানান মূক-বিভঙ্গে তিনি যথার্থ আন্তর্জাতিক মানের অভিনয়ে বাংলা ছবিকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। 'পরশ পাথর'-এ তিনি সত্যজিৎ রায়ের কাছে প্রাপ্য স্বীকৃতি পেয়ে আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলেন। একথা জানিয়েছেন অভিনেতা সৌমিত্র। প্রসঙ্গত, নায়ক ছাড়া কেন্দ্রীয় চরিত্রে কাউকে ভেবে নিয়ে চিত্রনাট্য একমাত্র তুলসীবাবুর জন্যই সত্যজিৎ করেন। কিন্তু এর বাইরে যে অজস্র ছবির মুহূর্তগুলিতে তিনি সেই ৪০-৫০ দশকের নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালির একেবারে নির্ভেজাল চরিত্র লক্ষণগুলিকে তাঁর অভিনয়ের মুন্সিয়ানায় চিহ্নিত করেছিলেন তার তুলনা দুষ্কর। এটি সম্ভব হয়েছিল তাঁর মানুষের আচার-আচরণকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের ফলে।

এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ছবির নাম না করলেই নয়। যেমন ধরুন অসিত সেনের 'দীপ জেলে যাই' ছবিতে নায়কের এক পরিচিত হিসেবে তিনি মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্রে ঢুকেছেন। এই দৃশ্যে তাঁর কোনো সংলাপ নেই, শুধুমাত্র চোখের দৃষ্টি দিয়ে বিভিন্ন বিকারগ্রস্তদের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করেছেন। একই সঙ্গে বিস্ময়, উৎকণ্ঠা, ভয়, কৌতূহল কী অবলীলায় তাঁর চোখে মুখে খেলা করেছিল! তা কিন্তু ভোলার নয়। 'চাওয়া-পাওয়া' ছবিতে ঘর পালানো সুচিত্রা সেন যে তাঁরই হোটেলে রয়েছে একথা জানার পর আবার সেই

তুলসী চক্রবর্তী ও রাজলক্ষ্মী দেবী (চাওয়া-পাওয়া)

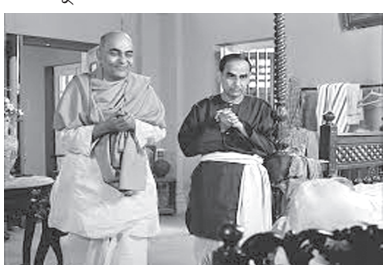

হরিধন ও প্রসাদ মুখোপাধ্যায় (কাপুরুষ-মহাপুরুষ)

অজয় মুখার্জী ও কামু মুখার্জী (সোনার কেল্লা)।

বিমূঢ় বিস্ময় ও তীব্র আনন্দের ঝলক। ব্যাপারটা ধরে ফেলায় উত্তমকে বলছেন, ''আগে জানতুম তেলে জলে মিশ খায় না। এখন দেখছি বেশ খাচ্ছে।'' নড়বড়ে হয়ে গিসলেন মহানায়ক। গিন্নী রাজলক্ষ্মীকে (আর এক প্রতিভাময়ী কমেডিয়ান) আদেশ দিলেন এদের জন্য 'এবেলা লুচি কর আর ওবেলা পোলাও, এদের আটকাতে হবে না।'' এ সংলাপ যে কী অবিস্মরণীয় ভঙ্গিমায় উচ্চারিত হয়েছিল ভাবা যায় না।

এরকম অজস্র 'সাড়ে চুয়াত্তর', 'কবি', 'একটি রাত', 'সবার উপরে' তাঁর হীরকদ্যুতিময় কত ছবিই না রয়েছে। কমেডিয়ানের পক্ষে ডায়লগ বলার টাইমিং ভয়ঙ্কর গুরুত্বপূর্ণ। তুলসীবাবু এতে ছিলেন সিদ্ধবাক। তাই হয়ত সত্যজিৎ রায় তাঁর মৃত্যুর পর বলেছিলেন, 'শুধু কমিক চেহারা থাকলেই কমেডিয়ান হওয়া যায় না, একটা বিশেষ ধরনের হাস্যরসবোধ আর দুর্দান্ত অভিনয়-ক্ষমতা থাকলে তবেই তুলসী চক্রবর্তী হওয়া যায়। তুলসীবাবুর জায়গা নিতে পারে এমন আর কেউ বাংলাদেশে নেই।' এর চেয়ে বড় শিরোপা আর কিই বা হতে পারে। সারাজীবন অর্থকষ্টে ভুগেছেন। নিঃসন্তান মানুষটির স্ত্রীকে দেখার কেউ ছিল না। বিশ্বসেরা পরিচালকের দেওয়া শিরোপাই অনন্য উপার্জন।

এবার বলব ওই প্রতিভাময়ী রাজলক্ষ্মী দেবীর কথা। অত্যন্ত পৃথুলা ও তেমন কোনো চটকদারি বা কৌতুকউদ্রেককারী মুখ-সৌষ্ঠব ছিল না তাঁর। কিন্তু সেই ৩০-এর

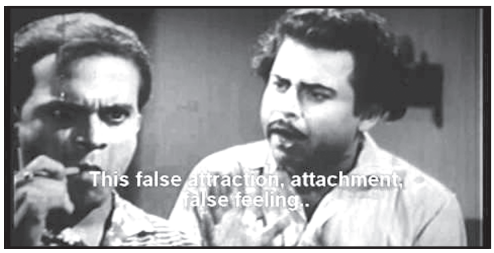

রবি ঘোষ ও অনুপ কুমার (বিবাহ বিভ্রাট)

জয়বাবা ফেলুনাথ ছবিতে সন্তোষ দত্ত (জটায়ু)।

ভানু-জহর (মিস প্রিয়ংবদা)

রবি ঘোষ (গল্প হলেও সত্যি)

দশক থেকে ১৯৭২-এ মৃত্যুর সময় পর্যন্ত বাঙালির অন্দরমহলের নারী চরিত্রগুলিকে ছোট্ট ছোট্ট ভূমিকায় তিনি অত্যন্ত রসালো মোড়কে তুলে ধরতেন। তাঁর চেহারা দেখলেই এক বিচিত্র ভয় মিশ্রিত হাসির ফল্গুধারা ছড়িয়ে পড়ত। সাধারণত উচ্চবিত্ত নয়, মধ্যবিত্ত বাঙালি প্রবীণা গৃহিণীদের যে রাগী চরিত্র চিত্রণে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন, তাতে তাঁর অধস্তন কুশীলবেরা সদা তটস্থ হয়ে পড়লেও দর্শকরা হেসে কুল পেত না। যেমন ধরুন সেই আমলে বেশিরভাগ বম্বের শিল্পী নিয়ে করা বিপুল জনপ্রিয় 'লুকোচুরি' ছবিটি। ছবিটির সাফল্যে কিশোর কুমারের চমৎকার অভিনয়ের সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর দাপুটে কমিক অভিনয়ের অবদান কোনো অংশে কম নয়। ছবিতে তিনি এক সম্পন্ন মহিলা, গাড়িতে বাজারে গিয়েছিলেন। ইত্যবসরে মেয়ে মালা সিনহা কিশোর কুমারকে বাড়িতে এনে গল্প করছে। তিনি হঠাৎ কী কারণে ফিরে এলেন। প্রেমিক ভয়ে আগেকার বড় রেডিওর পেছনে লুকিয়ে খবর পড়তে শুরু করল। কেননা, তিনি বাইরে থেকে পুরুষ কণ্ঠ শুনেছেন। হঠাৎ সংবাদপাঠক সোনার ভরি সেই ১৯৫৮ সালে ভয়ঙ্কর কম মাত্র ১০ টাকা বলে ফেলায় তিনি চকিতে ঘুরে রেডিওর পেছন থেকে কিশোর কুমারকে টেনে বার করলেন। এই অভিনয়ে যে সাবলীলতা সৌমিত্র যাকে বলেছেন 'গ্রেসফুলনেস', বা অভিনয় লাবণ্য প্রকাশিত হয়েছিল, তা দুর্লভ। মনে পড়ে অসিত সেনের সুপার হিট সুচিত্রার প্রতিনিধিত্বমূলক ছবি 'উত্তর ফাল্গুনী'র কথা। এখানে তিনি ওই বিপুল চেহারায় এক সোসাইটি লেডির ভূমিকায়। সাকুল্যে হয়তো ১০ সেকেন্ডের স্ক্রিন উপস্থিতি। বুফে ডিনার চলছে,

রাজলক্ষ্মী দেবী

সুচিত্রা জিজ্ঞেস করলেন আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না। কি স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় স্থূল চেহারা নিয়ে প্রবীণা রাজলক্ষ্মী বললেন (সেই ৫০ বছর আগে) 'আমি যে Dieting-এ আছি মা।' Bravo!

এমন শক্তিময়ী কমেডিয়ান ছিলেন রাজলক্ষ্মী যে বম্বে থেকে ডাকসাইটে পরিচালক বিমল রায় কলকাতায় এলেন তাঁর পুরো ইউনিট নিয়ে, পরবর্তীকালে বহু পুরস্কারপ্রাপ্ত 'দো বিঘা জমিন' করতে। তৎকালীন কলকাতার হতদরিদ্র অঞ্চলের এক বাড়িওয়ালির ভূমিকায় বাছলেন রাজলক্ষ্মীকে, যিনি সর্বভারতীয় স্তরে উপস্থাপিত হবেন। তাঁর কথা শুনলেই বস্তির লোকেরা ঘাবড়ে যায়। নায়ক কপর্দকহীন বলরাজ সাহানী এলেন ছোট ছেলে নিয়ে রাজলক্ষ্মীর ঘর ভাড়া নিতে। প্রথমে দূর দূর করে তাড়াবার পর ঘর দিলেন, বললেন, বিকেলের মধ্যে ভাড়া মেটাতে হবে। বাড়ি ফিরে ক্লান্ত বলরাজ দেখলেন রাজলক্ষ্মী ছেলের কপালে পরম যত্নে জলপট্টি দিচ্ছেন। বলরাজকে ঢুকতেই বিচিত্র হিন্দিতে দাবড়ালেন : 'তুম মানুষ হ্যায়! রুগ্ন লেড়কা রেখে চালা গিয়া?' দর্শকের হাসির তুফান রোখা যায় না। সেই ১৯৩২ সালের পল্লীসমাজ থেকে নাগাড়ে ১৯৭২ সালে 'পদীপিসির বর্মীবাক্স' অবধি ৪০ বছর পর্দায় টিকে থাকা কম কথা নয়। এখনকার দিনে এগুলি বিরল দৃষ্ট। যাঁরা হারিয়ে যাওয়া বাঙালি চরিত্র, সংস্কৃতি, জীবনচর্চা ফিরে দেখতে চান ছবিগুলি দেখুন। কলকাতার ভাল ভিসিডি/ডিভিডি-র দোকানে গেলেই পাবেন। ছবিগুলি সম্পূর্ণ Restored অবস্থায় হাজির করা হয়েছে।

এবারে আসব আর এক যশস্বী কমেডিয়ানের কথায়, যাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার। প্রথম জীবনে চাকরি করতেন ব্যাঙ্কশাল কোর্টে। কোর্ট আর হাসপাতাল এই দুটি জায়গা মানব জীবনের যে কত বিচিত্র অনুভূতির উন্মোচনস্থল তা যাঁরা একটু যাতায়াত করেছেন, তাঁদের আর বলে দিতে হবে না। জনপ্রিয় কথা-সাহিত্যিক শংকর এই আদালত জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনী 'কত অজানারে' প্রকাশ করেই বাজার মাত করে দেন। আদালতে একই সঙ্গে রবি ঘোষ দেখেছেন মামলাজয়ী মানুষের প্রসন্নতাভরা মুখ, পাশেই অনুভব করেছেন পরাজিতের মর্মবেদনা। এসবই পরবর্তীকালে তাঁর কৌতুকময় প্রাণবন্ত চরিত্রগুলির পর্দায় রক্তমাংসের মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনে সহায়ক হয়েছিল। রবি ঘোষ তাঁর প্রথম ছবি 'অভিযান' থেকেই এক বিরল গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর কোনো সংলাপ না থাকলেও তিনি অন্য অভিনেতার কথার প্রতিক্রিয়ায় কিছু না কিছু করেই যেতেন। বাংলার সর্বকালের সেরা হাসির ছবি 'ধন্যি মেয়ে' যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের মনে পড়বে পার্থ মুখার্জি-জয়া ভাদুড়ির বিয়ের দৃশ্যটি। সেখানে রেকর্ডে বিয়ের মন্ত্র (প্রথমে রবিবাবু শ্রাদ্ধের রেকর্ড চালিয়েছিলেন, ধরা পড়ায় অনবদ্য ভঙ্গিমায় বললেন, 'ভুল হয়ে গেছে') বেজে চলেছে। তাঁর কোনো সংলাপ না থাকলেও তিনি কখনও মাথা নাড়ছেন, কখনও আশীর্বাদ করার ভঙ্গি করে পর্দা মাতিয়ে রেখেছেন। বিখ্যাত 'বসন্ত বিলাপ'-এ তিনি ফাটাফাটি কাজ করেছিলেন। অনেকদিন আগে 'সাধু যুধিষ্ঠিরের কড়চা' নামে তাঁর দীর্ঘ অভিনয় সমৃদ্ধ একটি ছবি এসেছিল। তাতে একটি বাড়িতে ঢুকতেই দুটি বিশালাকার কুকুর তাঁকে ঘিরে ধরে। এই সময় তাঁর আতঙ্কিত শব্দহীন অভিনয়ে মানুষ চুটিয়ে হেঁসেছিলেন ঠিকই কিন্তু রবি ঘোষের অভিনয় সৌন্দর্যের নিখুঁত প্রয়োগেই এটা সম্ভব হয়েছিল। শোনা যায়, সার্কাসের বাঘ হলেও 'গুপী বাঘা' ছবিতে তিনি অকুতোভয় হয়ে বাঘের ঘরে ঢুকেছিলেন। এমনই ছিল তাঁর অভিনয় নিষ্ঠা। রবি ঘোষ বাঙালি জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে নিরীক্ষণ করেছিলেন। তরুণ মজুমদারের 'ঠগিনী' ছবিতে উৎপল দত্তের এক ঠগবাজের ভূমিকায় তাকলাগানো অভিনয়ের পাশে রবি ঘোষও তাঁর সহকারি হিসেবে গোটা ছবি জুড়ে দর্শকমন অধিকার করেন। আবার সত্যজিৎ রায়ের 'জনঅরণ্য' ছবিতে দেহব্যবসার দালাল চরিত্রকে তিনি যে অভিনয় উচ্চতায় তুলেছিলেন তার কোনো জুড়ি নেই। চার্লি চ্যাপলিন যুগপৎ কান্না-হাসির অভিনয়কলার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিলেন, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বাক সৃষ্টি Gold Rush ছবিতে। তাঁর তুষারঢাকা জনহীন পর্বতচূড়ায় খাদ্যাভাবে জুতো সেদ্ধ খাওয়ার দৃশ্যে হাসির হুল্লোড়ের ফাঁকে দর্শকের সংগোপন অশ্রুপাতও মন্থরভাবে মিশে যেত। এ অভিনয় একমাত্র চার্লিই করেছেন, তিনি

একমেবাদ্বিতীয়ম্। পরবর্তীকালে বম্বেতে রাজ কাপুর চার্লিতে অনুপ্রাণিত হয়ে চেষ্টা করেছিলেন। বাংলায় একেবারে প্রথম দিকে পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'ছায়াসূর্য' ছবিতে রবি ঘোষের অর্থসঙ্কটে আক্রান্ত একজন প্রবাসী উকিলের ভূমিকা ছিল। সেখানে বাড়ির অনেকেই গরমের কারণে তাঁকে কোট খুলে বসতে বলছে, তিনি কিছুতেই খুলবেন না। শেষকালে খুলতে দেখা গেল তাঁর ভেতরে শুধুই গেঞ্জি, সেটি শতচ্ছিন্ন। দৃশ্যটি অবশ্যই পরিচালকের ভাবনা, কিন্তু যে মর্মন্তুদ হাসির নিয়ন্ত্রণে রবি ঘোষ দৃশ্যটিকে ভরিয়ে দিয়েছিলেন তা একান্তই চ্যাপলিন ঘরানার নিপুণ অভিনয়।

শরীরকে মজবুত রাখতে প্রথম জীবনে ওয়েট লিফটিং করতেন রবিবাবু। শরীরচর্চার অভ্যাস তিনি কখনও ছাড়েননি। তারই প্রতিফলন সকলে দেখেছেন তাঁর একাধারে মননশীল অন্যদিকে দুর্দান্ত শারীরিক অভিনয় সম্বলিত একশো শতাংশ বাঙালি পারিবারিক জীবনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি 'গল্প হলেও সত্যি' ছবিতে। বাড়ির কর্তা অঘোর চক্রবর্তীকে রবি ঘোষের ভাষায় 'টেপাটেপি' করার সময় তাঁর নিজের কণ্ঠে গান অবিস্মরণীয়। কর্তাকে ঘিরে বসে আছেন প্রবীণ বৃদ্ধের দল, এখন আর এসব দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হয় না। রবি ঘোষের কথা অফুরান। তাঁর অভিনয় দর্শক মনে এক ঝলক পরিহাস প্রবাহ বয়ে এনে দৈনন্দিন জীবনের ক্লেদ, গ্লানি থেকে একটা তাৎক্ষণিক মুক্তির স্বাদ দিত।

এ সত্য জানতেন সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহরা। কেননা তাঁরাও সর্বাংশে ছিলেন বাংলা সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বমূলক পরিচালক। সত্যজিৎ রায়ের 'অভিযান' থেকে বিরিঞ্চিবাবার চেলার 'কাপুরুষ-মহাপুরুষ' থেকে 'আগন্তুক' পর্যন্ত বহু ছবিতে তাঁর জন্য থাকত উজ্জ্বল ভূমিকা। কয়েক প্রজন্মের বাঙালি শৈশব, কৈশোরকে নির্মল আনন্দে ভরিয়ে রাখতে গুগাবাবা কি তিনি ছাড়া হত? আবার সম্পূর্ণ আরণ্যক পরিবেশে আদ্যন্ত শহুরে বন্ধুবান্ধব নিয়ে 'অরণ্যের দিন রাত্রি' ছবিটি তাঁর সংলাপ প্রাচুর্য ও বহুবর্ণরঞ্জিত অভিনয়ে টইটম্বুর। মনে পড়বে সেই দৃশ্যটির কথা, উপজাতি মেয়ে সিমিকে দেখে মুগ্ধ রবি তাকে বাংলোয় কাজের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সিমিকে চলে যাওয়ার সময় তিনি সামান্য টাকা দেন। বন্ধুরা চেপে ধরতে অসাধারণ মুন্সিয়ানায় উচ্চারণ করলেন 'আরে ভাই ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার'। তখন বিষয়টি সবে বাজারে আসছে। কিংবা শর্মিলাদের দেখে অভিভূত হয়ে তাঁর 'সো কাইন্ড অফ ইউ'-এর জায়গায় 'সো খাইন্ড অফ ইউ'-এর মাধুর্য। দেখুন, সংলাপ লেখা হয়, অভিনয়রীতি পরিচালক দেখিয়ে দেন, সবই ঠিক, কিন্তু রেসে যেমন যত বড় জকিই চালকের আসনে থাকুক না কেন শেষমেষ বাজি মারে সেই ঘোড়া। কমেডিয়ান রবি ঘোষের সংলাপ প্রক্ষেপণই ভবিষ্যৎ অভিনেতার সিলেবাস।

ভানু ও তরুণ কুমার (স্বর্গ মর্ত পাতাল)

বাংলা কমেডি ছায়াছবির আলোচনায় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মতো তুলসী, রবির সঙ্গে আর একটি অসামান্য জুড়ি সিনেমাপ্রেমীদের আজীবন ভালবাসা পেয়ে এসেছেন, তাঁরা হলেন ভানু-জহর। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর রায় সেই বিরল সম্মানের অধিকারী— যাদের নিজেদের নাম দিয়ে 'ভানু গোয়েন্দা জহর অ্যাসিসটেন্ট'-এর মতো ছবি তৈরি হয়েছে। মানুষ তা সানন্দে গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় একান্ত বাঙালিয়ানার ভাঁড়ারে তৈরি বৈচিত্র্যময় অভিনয়শৈলী দিয়ে একাই অনেক কমেডি ছবিকে চূড়ান্ত বক্স অফিস সাফল্য এনে দিয়েছেন। চল্লিশের দশক থেকে আমৃত্যু ১৯৮৩ অবধি তিনশোর বেশি ছবিতে কাজ করেছেন। বিদেশি সিলুয়েট পত্রিকা তাঁকে 'common man's comedian' আখ্যা দিয়েছিল। ১৯৫৮ সালের সেই ন্যূনতম প্রযুক্তির যুগে তিনি ধুতি-শার্ট সম্বল করে 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' ছবিতে যুক্তি দিয়ে নারায়ণকে বোঝাচ্ছেন বেহুলাকে যেমন তার স্বামীর প্রাণ ফেরত দেওয়া হয়েছিল, তিনিও স্ত্রীর মৃত্যু পরবর্তী অনুগমন করেছেন। তাঁকেও একই সুযোগ দেওয়া হোক। তিনি নিজে বলছেন, ব্রহ্মার সঙ্গে তখন 'আমার চরম

বাদানুবাদ হচ্ছে প্রাণ ফেরত দেবে কি দেবে না'। তার সহজ কৌতুকের প্রবহমাণতা দর্শকমন আপ্লুত করে দেয়। 'আশিতে আসিও না' ছবিতে প্রবীণ ছেলেদের তরুণ বাবা হিসেবে তাঁর অভিনয় চলচ্চিত্র ইতিহাসে বেনজির। আজও প্রায়শই অত পুরনো নড়বড়ে প্রযুক্তি সংবলিত 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' ছবিটি ভানু ব্যানার্জির অভিনয় প্রসাদে বারবার চ্যানেল চ্যানেলে দেখানো হয়। তাঁর 'মিস প্রিয়ংবদা' ছবিতে মহিলা নার্সের ভূমিকার কৌতুক পুরনো চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মনে পড়বে। ভানুবাবুকে চলচ্চিত্রে যে সব হালকা চালের পরিহাসপ্রবণ ভূমিকায় দেখতে আমরা অভ্যস্ত, তা কিন্তু তাঁর ব্যক্তি জীবনেও সমানভাবে বজায় ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে সে অর্থে তাঁদের জুটির বিরুদ্ধেই কারুর কোনো অভিযোগ ছিল না। দুজনই কিন্তু প্রচুর পড়াশোনা করতেন। দেখতেন হলিউডের বহু ছবি। কিন্তু তাঁদের অভিনয়ে কোনো অনুকরণ ছিল না। ধুতি পাঞ্জাবি বা সামান্য শার্টের পোশাকে তাঁরা আনন্দ-উচ্ছল অভিনয় করে নানা সমস্যাজর্জর বাঙালির জীবনযন্ত্রণায় এক আশ্চর্য-মলমের স্নিগ্ধ প্রলেপ লাগিয়ে দিতেন। বাঙালির জীবনবোধ ও সমকালীন ভাবনার যে ছবি তাঁরা নিজস্ব স্বকীয়তায় রেখে গেছেন তা চিরকালীন সম্পদ। মনে পড়ে ধুতি পাঞ্জাবির শুভ্র ঢিলেঢালা পোশাকে 'নিশিপদ্ম' ছবিতে জহর রায় মহিলাদের মধ্যে এলেন। তারা প্রশ্ন করল আজ আপনার এত দেরি? জহরবাবু বললেন, 'দেখ তোমাদের বাড়ি আসতে গেলে বাড়তি টাকা লাগে, তাই ভায়া কাবুল (কাবুলিওয়ালা) আসতে হয়। এই আর কী!' কী আশ্চর্য উৎসারিত কৌতুকে তিনি এই অভিনয় করেছিলেন তা আজও স্মৃতিতে অমলিন। অমলিন বাংলার আরও বহু কমেডিয়ানদের চরিত্র সৃষ্টির স্মৃতি। স্থানাভাবে সেই অতীত অভিনেতাদের উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। সত্যজিতের ক্ষুরধার হিউমার সমৃদ্ধ কাপুরুষ-মহাপুরুষ ছবির সংলাপ ঘরে ঘরে জনপ্রিয় করেছিলেন হঠাৎ কমেডিয়ান চারুপ্রকাশ ঘোষ। কিন্তু তরুণ কুমার, কামু মুখার্জী, অজয় ব্যানার্জী, চিন্ময় রায় মূলত কৌতুক অভিনয় করেই মনে রয়ে গেছেন। হরিধন মুখার্জির প্রবীণ চরিত্রগুলি, অনুপকুমারের মার্জিত কৌতুক, সর্বোপরি জটায়ুর ভূমিকায় ইতিহাস হয়ে যাওয়া সন্তোষ দত্ত। শুনেছি ফৌজদারি আদালতে প্র্যাকটিস করা সন্তোষ দত্তের সঙ্গে কোনো মামলার লড়াই হলে বিরোধী পক্ষের উকিল বলতে উঠেই প্রায়শ হেসে ফেলে মামলা হাল্কা করে ফেলতেন। জাত-কমেডিয়ান ছিলেন তিনি। পরিতাপের কথা, বাংলা ছবির কমেডিয়ানরা একটু তাড়াতাড়িই যেন পৃথিবী ছেড়েছেন। তুলসীবাবু ৬০ বছর, রবি ঘোষ ৬৬, জহর রায় ৫৮, ভানুবাবু ৬৩, সন্তোষ দত্ত তিনিও ওই ৬৩। বাংলা ছবির দুর্ভাগ্য তার ধুরন্ধর কমেডিয়ানরা খানিকটা অভিমান করেই যেন চলে গেছেন। তাঁদের প্রতিভানুগ চরিত্র তাঁরা হয়ত কমই পেয়েছিলেন।

তবে আনন্দের কথা, তাঁদের রেখে যাওয়া বাংলা কমেডি ছবির অভিজাত উত্তরাধিকারে কিছুকাল ভাটার টান থাকলেও বিগত কয়েক বছর ধরেই বেশ ছিমছাম— একেবারে হালফিল ভাবনা নিয়ে দারুণ সব ছবি তৈরি হচ্ছে। এগুলির বিষয় বৈচিত্র্যেরও তুলনা নেই। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'রামধনু' তাঁর নিজের অভিনয় দীপ্তিতে ভাস্বর। স্কুলে ছেলে মেয়ে ভর্তি সংক্রান্ত অভিভাবকদের উদ্বেগ নিয়ে একবারে নতুন আঙ্গিকে ছবিটি তৈরি। তেমনি দুর্দান্ত সাড়া জাগানো অনীক দত্তের 'ভূতের ভবিষ্যৎ' ২০১২ সালের সেরা হিট। সকলেই অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপমুখর ছবিটিতে দেখেছেন প্রমোটাররাজ থেকে বাঁচতে ভূতেদের কীর্তিকলাপ। অতীত দিকপালদের শূন্যস্থান ভরাট করতে উঠে এসেছেন খরাজ মুখোপাধ্যায়, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, পরান বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রতিভাবান অভিনেতারা। এরা মূলত চরিত্রাভিনেতা হলেও 'ভূতের ভবিষ্যতে' শাশ্বতর অভিনয় হাইক্লাস কমেডি। ছবিটির সংলাপও চটুল ব্যঞ্জনাময়। একই সঙ্গে নানান সময়সীমার মানুষের একই ফ্রেমে উপস্থিতি অভাবনীয়। পরানবাবু ছবির পর ছবিতে নিজেকে উজাড় করে দিচ্ছেন। 'স্বাদে আহ্লাদে'তে পাওয়া গেছে অনবদ্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তীকে। 'বেলাশেষে' সুপারহিট হওয়ার গৌরবে খরাজ মুখার্জির তুখোড় কৌতুকের অবদান আদৌ ফেলনা নয়। সম্প্রতি নতুন রেকর্ড তৈরি করে তাঁকে 'Hero by default' -এর যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়েছে। 'পরশপাথর' ছবিতে পরেশ দত্ত-রূপী তুলসী চক্রবর্তী বলেছিলেন বাংলার সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে হবে। সত্যিই তাই। বাংলা ছবির হাস্যরসের ঝকঝকে পথকে আরও চাকচিক্যময় করে তোলার অভিনেতা, দক্ষ পরিচালকেরা মজুত। এটি বাঙালির মনের পক্ষে তো বটেই আধুনিক নিদানে তার স্বাস্থ্যের পক্ষেও সুসংবাদ।

সূত্র :— ১) *অগ্রপথিকেরা* - সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, (২) *Our Film Their Film* - Satyajit Ray, (৩) *আমার চ্যাপলিন* - মৃণাল সেন।

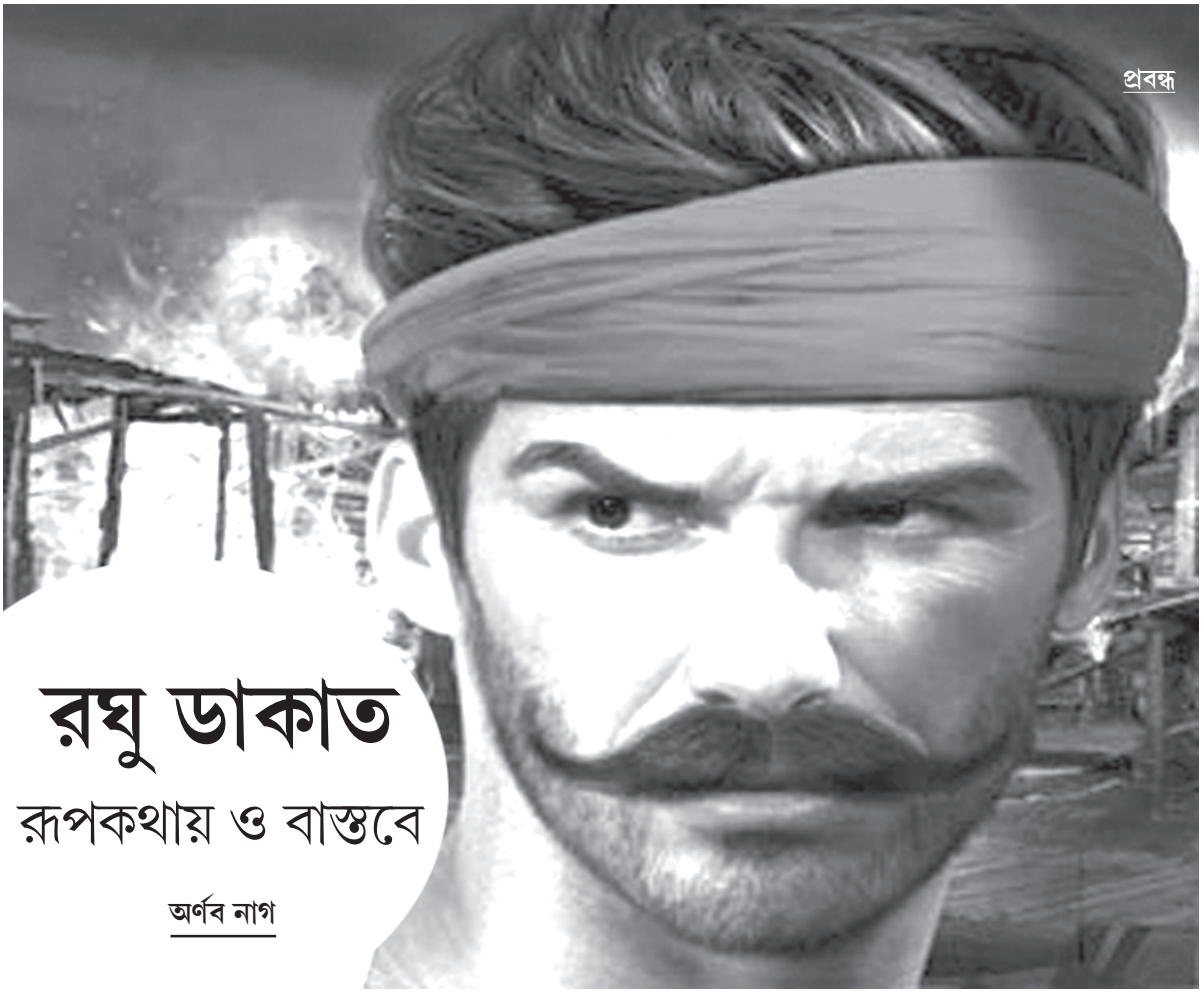

রঘু ডাকাত

রূপকথায় ও বাস্তবে

অর্ণব নাগ

বঙ্গের ডাকাতিয়ানায় রঘুবাবুর একটা আলাদা মহিমা রয়েছে। আমাদের কথাবার্তায় আজও 'রঘু ডাকাতের মতো দস্যি' কিংবা 'ওরে বাবা! যেন রঘু ডাকাত' গোছের বাক্য-প্রয়োগ বুঝিয়ে দেয় বঙ্গ-মানসে 'রঘু ডাকাত' রীতিমতো প্রবাদ-গাথার মর্যাদা লাভ করেছে। এমনিতেই বাঙালির ইতিহাস-চেতনা বলে কিছু নেই, তার ওপর কিংবদন্তীকে ইতিহাস বলে চালানোর প্রবণতা রয়েছে। তাই রঘু ডাকাতের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোনো ইতিহাসই নেই, যেটুকু যা আছে তাকে মোটের ওপর কিংবদন্তী বলা চলে। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ইতিহাস জোগাড়ের কাজটা যথেষ্ট মুশকিলের। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বাংলার ডাকাত' শিশুপাঠ্য গ্রন্থ হলেও তাতে ইতিহাসের আস্বাদন রয়েছে। তিনি সরকারি কাগজপত্রে রঘু ডাকাতের পরিণাম কী হয়েছিল সে সন্ধান পাননি। তবে জানিয়েছেন : 'গভর্নমেন্ট সে সময়ে রঘু ডাকাতকে ধরিবার জন্য অনেক টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। তখন সরকার ডাকাতদের দমন করিবার জন্য একটি দপ্তরও খুলিয়াছিলেন।' ('বাংলার ডাকাত', যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অখণ্ড শৈবা সং, ২০১১, পৃ: ৬৪)।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে বিনয় ঘোষ, হালফিল সময়ে স্বপন বসু সেকালের সাময়িকপত্র থেকে সংকলনের মাধ্যমে বাঙালির সামাজিক-সাংস্কৃতিক, সর্বোপরি অর্থনৈতিক দিনযাপনের যে চিত্র উপস্থিত করেছেন, তাতে বঙ্গের অপরাধ জগতের নকশা রয়েছে। কিন্তু এতে রঘু ডাকাত অনুপস্থিত। এবার খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। রঘু 'ডাকাত' হওয়ার সূত্রে কি অপরাধ জগতেরই লোক হবেন? কিংবদন্তী বলছে, সেরকম কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বরং রবীন হুডের মতো রঘু ডাকাতেরও গরিব-দরদি একটা ভাবমূর্তি ছিল। যিনি ধনীর প্রতি যতই নির্দয় হোন না কেন, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষ ও বিধবাদের প্রতি তাঁর দয়ার অন্ত ছিল না। মহারানি সুনীতি দেবীর বয়ানেও রঘু ডাকাতের এই রবীন হুড-সুলভ ভাবমূর্তি উঠে এসেছে — "At that time there flourished a notorious dacoit, Raghu, for whose capture Government had offered a handsome reward. But like Robin Hood of old, Raghu Dacoit had caught popular

fancy by his generosity to the poor. Though he looted the rich, to the needy, the famine-stricken and widows he was always king. No one would inform against him." ('Bengal Dacoits and Tigers', Maharanee Sunity Devee, C.I. of Cooch Behar, Calcutta, 1916, p. 25)।

কিন্তু রূপকথা আর বাস্তবে আকাশ-পাতাল তফাত। বাস্তবের ডাকাতদের কি অত সদয় হওয়া চলে? প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তর' কিংবা গিরিশচন্দ্র বসুর 'সেকালের দারোগার কাহিনী'-র মতো সে যুগের পুলিশের অভিজ্ঞতা এব্যাপারে বেশ তিক্ত। বলা বাহুল্য, বাস্তবের এইসব গোয়েন্দা কাহিনিতেও ডাকাত রঘুর অস্তিত্ব বিন্দুমাত্র নেই। সম্প্রতি এ ধরনের কিছু বই-পত্রের আলোচনা করা কালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার শিক্ষক বিশ্বজিৎ রায় একটা মোক্ষম কথা বলেছেন : 'দারোগার বয়ানে ভাল ডাকাতের কথা নেই।' ('আনন্দবাজার পত্রিকা', ৯ জুলাই, ২০১৬)। বাঙালি দারোগাদের কথা ছেড়েই দিন। ব্রিটিশ ডিটেকটিভ আর. রীডের 'Every Man his own Detective' (১৮৮৭ খ্রি.)-এর কলকাতা-অংশ (পরিমল গোস্বামী-কৃত অনুবাদ 'ইংরাজ ডিকেটটিভের চোখে প্রাচীন কলকাতা', উর্বি. ২০০৯)-তেই বা ভালো ডাকাতের কথা কোথায়? যে ব্রিটিশ সরকার রঘু ডাকাতের সন্ধানের জন্য পুরস্কার-মূল্য পর্যন্ত ঘোষণা করেছিল তাদের ডিকেটটিভ ডিপার্টমেন্টের এক আধিকারিকের স্মৃতিচারণাতেও সেই রঘু ডাকাতের অস্তিত্ব অবধি নেই!

রঘু ডাকাত সংক্রান্ত এই ঐতিহাসিক উপাদানের অপ্রতুলতাই তাকে ঘিরে নানান কিংবদন্তীর জন্ম দিয়েছে। গোয়েন্দা-কাহিনিতে না এলেও গোয়েন্দা উপন্যাসে রঘু বিরাজ করেছেন স্বমহিমায়। শরচ্চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'গোয়েন্দা-কাহিনী' পত্রিকায় প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল পাঁচকড়ি দে-র 'রঘু ডাকাত' উপন্যাস। পরে ১৮৯৫ সালে তা গ্রন্থবদ্ধও হয়। এই উপন্যাসের বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছিল : 'সেই বিশ্ববিখ্যাত রঘু সর্দারের ভীষণ কাহিনী পড়িতে কাহার না কৌতূহল হয়? অনেকে কেবল সেই দুর্দ্দান্ত রঘু ডাকাতের নাম মাত্র শুনিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অপূর্ব কার্য্যকলাপ, অসীম প্রতাপের কথা সকলকেই বিস্ময়চকিত চিত্তে পাঠ করিতে হইবে; সকলে সত্বর হউন, প্রত্যহ রাশি-রাশি পুস্তক বিক্রয় হইতেছে, চিত্রশোভিত ও সুরম্য বাঁধান।'

অথচ মজার ব্যাপার হলো, বিজ্ঞাপন দেখে সেই 'রঘু ডাকাত'-এর কথা মনে পড়লেও উপন্যাসে এই রঘু হলেন রাজপুত বংশ-জাত। রাজস্থানের পার্বত্য প্রদেশের বুঁদী অঞ্চলের এক অসামান্যা সুন্দরী তারাবাঈয়ের প্রেমে-পাগল এক ডাকাত রঘুনাথ সিংহ। পাঁচকড়ি বাবুরই আরেকটি বিখ্যাত ডাকাতে-উপন্যাস 'সতী-সীমন্তিনী (বা বাঙ্গালীর বীরত্ব)'। এই কাহিনিতেও রঘু ডাকাতের কথা রয়েছে। বিশেষ করে এই উপন্যাস রঘুর শিষ্য 'ভীষণ দস্যু' রত্নাপাখিকে কেন্দ্র করে। এখানে রঘু নিখাদ বাঙালি। উপন্যাসে রঘু হলেন রাঘব সেন। এও দেখা যায় সহধর্মিনী কজ্জলার প্রভাবে দস্যু রত্নাপাখি দস্যুগিরি পরিত্যাগ করে রীতিমতো ভালো মানুষ হয়ে উঠেছে। ফলে রঘু ডাকাতের সঙ্গে তার বিচ্ছেদও অনিবার্য হয়ে পড়ে।

ইতিহাস না থাকার কারণেই বাস্তবের রঘু ডাকাতের পদবী নিয়েও বিভ্রাট রয়েছে। আজকের দিনে জাতপাতের প্রসঙ্গ অত্যন্ত কুরুচিকর ও নিন্দনীয় কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সে যুগে জাতপাতের যে সামাজিক বাদ-বিচার ছিল, সেকালের সমাজতান্ত্রিক ইতিহাস রচনায় আজকের দিনে তার প্রাসঙ্গিকতা অনিবার্য। অনেকেরই ধারণা, ডাকাতি বা লুঠতরাজ ছিল তথাকথিত নিম্নবর্গীয়দের একচেটিয়া অধিকার। সেই সূত্রে রঘু ছিলেন দুলে বা বাগদী সম্প্রদায়ের, এমন কিংবদন্তী প্রচলিত। কিন্তু আগেই বলেছি, দুষ্কর্মা ডাকাতদের মধ্যে রঘু গণ্য হননি কোনোকালে। সুতরাং জনশ্রুতি রটেছে রঘু ছিলেন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ সন্তান। ইংরেজ আর জমিদারদের অত্যাচার ঠেকাতে হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন অস্ত্র। তাই রঘুর খ্যাতি 'ডাকাত'-এই, তাঁর পদবীর খোঁজ আমরা রাখিনি। রঘু ডাকাতকে নিয়ে যাত্রাপালাও হয়ে গিয়েছে। পরিচালক ছিলেন অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে নিয়ে গিরীন মুখার্জি সিনেমা পর্যন্ত তৈরি করে ফেলেন।

স্বপন মৈত্র তাঁর 'মাতৃ আরাধনায় বাংলার ডাকাত' (রক্তকরবী, ২০০৯, পৃ: ৩৮) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন : 'যারা অত্যাচারের প্রতিবাদ করে নীলকরদের বিরুদ্ধে লাঠি ধরেছিল ইংরেজ তাদের ডাকাত বলে প্রতিপন্ন করতেও দ্বিধা করেনি। আর এই প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করতে গিয়ে হয়ত তারা সত্যিকারের ডাকাতেই পরিণত হয়ে যেত। কারণ তখন আর তারা ঘরে ফিরে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারত না। সপ্তগ্রামের রাম আচার্যের ছেলে রঘুনাথ আচার্য ছিল এক প্রতিবাদী যুবক। নীলকরদের কুঠিতে নিয়ে গিয়ে তার বাবার উপর শারীরিক নির্যাতন ও পরে তার মৃত্যু দেখে এই প্রতিবাদী যুবকই একদিন হয়ে উঠেছিল বাংলার বিখ্যাত ডাকাত-সর্দার রঘু। নিয়েছিল নিজ হাতে বাবার হত্যার বদলা। নিজের দল

সুনীতিদেবীর বইতে আঁকা মাধববাবু ও তাঁর অনুচরবৃন্দ : রঘু ডাকাতের প্রতীক্ষায়।

তৈরি করে রঘু শুরু করে ডাকাতি। রঘুর নাম ও প্রতাপ ছিল সারা বাংলা জুড়ে।'

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই কাহিনির ভিত্তি কিংবদন্তী-জনিত, ঐতিহাসিক নয় মোটেও। রঘু সম্পর্কে আরও জনশ্রুতি : 'রঘু ডাকাত একজন বিখ্যাত লাঠিয়াল দস্যু ছিল। তাহার হাতে সর্বদা একখানা দীর্ঘ লাঠি থাকিত। তাহার দলের ডাকাতেরা লাঠি, তরোয়াল, ঢাল, বল্লম ও সড়কি নিয়া ডাকাতি করিতে ছিল দক্ষ। শিকারি নামে একদল লোক রঘু ডাকাতের দলে ছিল।' ('বাংলার ডাকাত' : যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত)। প্রসঙ্গত, 'শিকারি'দের লক্ষ্ণৌ থেকে বাংলায় এনেছিলেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। প্রথমে এদের জীবিকা ছিল শিকার করা। পরে বংশবৃদ্ধিজনিত কারণে 'ডাকাতি' পেশায় তা রূপান্তরিত হয়। রঘু ডাকাতের ঐতিহাসিক উদ্ধার খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজার মতো, যে দুঃসাহস আজ অবধি কেউই দেখাননি। তবে এক্ষেত্রে একটি স্বল্পায়তন পথের অনুসন্ধান করা যেতে পারে। সৌজন্যে প্রখ্যাত শিল্পী অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মজৈবনিক রচনা — 'ভারতের শিল্প ও আমার কথা' (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত, এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং, ১৩৭৬ ব.)। যাতে তিনি লিখেছেন : 'আমার পিতামহ অবিনাশচন্দ্র গাঙ্গুলীর পুণ্যেতে আমরা পেয়েছিলাম প্রকাণ্ড একটি বাগান। দশ বিঘা জমির উপরে তিনটি পুকুর ও একটি দোতলা বাড়ি ছিল সে বাগানে। আর ছিল প্রচুর নানারকম ফল ও ফুলের গাছপালা। জায়গাটি হোল ৩১ নম্বর গোপাললাল ঠাকুর রোড, বনহুগলী, চব্বিশ পরগণা। বরাহনগরের কাছে।' (পৃ: ৭২) এরপরেই সেই আসল অংশ : 'দলিলে দেখেছি ক্রেতা অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (আমার পিতামহ), আর বিক্রেতা রঘুনাথ সর্দার। অর্থাৎ তখনকার কালের বিখ্যাত রোঘো ডাকাত। শুনেছি, বাগান বিক্রীর অনেক পরেও তার বংশের ছেলে-নাতিরা আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসত। আমরাও ছেলেবেলায় তার এক নাতিকে দেখেছিলাম। দীর্ঘাঙ্গ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, হাতে প্রকান্ড লাঠি। আমাদের বাগানের গেট থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত প্রায় তিনশ' ফুট রাস্তা ঐ লাঠির উপর ভর দিয়ে কয়েকটি লাফেতে অতিক্রম করে সে আসতো' (পৃ: ৭২)।

অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ওরফে ও. সি. গাঙ্গুলি (জন্ম ১৮৮১ খ্রি:)-র এই স্মৃতিকথার সূত্রে অনুমান করা চলে রঘু ডাকাতের জন্ম অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্বে এবং তার রমরমা উনিশ শতকের প্রথম পর্বে। সম্ভবত নীল বিদ্রোহ (১৮৬০ খ্রি.) তো বটেই, সিপাহী বিদ্রোহ তথা মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭ খ্রি.)-এর পূর্বেই রঘু ডাকাতের অস্তমিত মহিমা। তবে কি রঘু

ডাকাতের ঐতিহাসিক সন্ধান মিললো?

একেবারে যে মেলেনি তাই বা বলি কী করে? এক্ষেত্রে অবশ্য ক্ষেত্র অনুসন্ধানের সাহায্য অবশ্যম্ভাবী। ও সি গাঙ্গুলির উপরোক্ত স্মৃতিচারণায় স্পষ্ট, উত্তর-কলকাতার শহরতলী অঞ্চল বনহুগলি-তে রঘু ডাকাতের কিছু সম্পত্তি ছিল। ক্ষেত্র সমীক্ষায় পাওয়া যাচ্ছে এই তথ্যের সমর্থনে বাড়তি কিছু রসদ। যেমন বনহুগলির নিকটবর্তী ৮৫ কাশীপুর রোডস্থিত সুবিখ্যাত কয়লা ব্যবসায়ী বামনদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯২১)-এর বাড়ির উত্তরদিকে কাশীপুর থানার অধীন এক পুলিশ ফাঁড়ির (পরবর্তীকালে যা কাশীপুর ইন্সটিটিউশন অব গার্লস-এ পরিণত হয়েছে। বর্তমান ঠিকানা : ৮৬ কাশীপুর রোড) বাইরে মার্বেল পাথরের দু'টি ফলকে হিন্দি ও বাংলায় বহু বছর ধরে লেখা ছিল— 'এই স্থানে রঘু ডাকাতের পূজিত শিবলিঙ্গদ্বয় অধুনাপি পূজিত হইতেছে।' কয়েক বছর আগে ফলক দুটিকে অপসারিত করা হয়। বিষয়টির সাক্ষ্য পাচ্ছি রাধারমণ মিত্রের লেখাতেও : 'কাশীপুর রোডের উপর বামনদাস মুখুজ্যের ঠাকুরবাড়ির উত্তরে এক বড় বাড়িতে বরানগর বা কাশীপুর থানার অধীন এক পুলিশের ফাঁড়ি ছিল। ঐ ফাঁড়ির রাস্তার দিকের একটি ঘরে এক পাথরের শিবঠাকুর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বাইরে লেখা ছিল 'রঘু ডাকাতের প্রতিষ্ঠিত মহাদেব'। ('কলিকাতা দর্পণ' : রাধারমণ মিত্র, সুবর্ণরেখা, ২০০৮। পৃ: ৭৪)।

বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের সেই বাড়ি আজও আছে। বরাহনগর-কাশীপুর অঞ্চলের মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর বাড়ির 'কৃপাময়ী কালী' আদতে রঘু ডাকাতেরই। এবং বামনদাসবাবুই রঘু ডাকাতের পূজিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গের মধ্যে দুটিকে (দুর্গেশ্বর ও ক্ষেত্রেশ্বর) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই কৃপাময়ী কালীসহ দুর্গেশ্বর, ক্ষেত্রেশ্বর বামনদাসের ঠাকুরদালানে আজও পূজা পাচ্ছেন। যদিও এঁদের পারিবারিক সূত্রে জানা যাচ্ছে, ১৯০৪ সালে বামনদাসবাবু স্বয়ং এখানে 'কৃপাময়ী কালীমূর্তি'কে স্বহস্তে প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাবা দুর্গাদাস ও মা ক্ষেত্রময়ীর নামে উপরোক্ত শিবলিঙ্গদ্বয়ের নামকরণ করেন। এই দাবি-পাল্টা দাবি নিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মুখার্জি পরিবারের মামলা আদালত অবধি গড়িয়েছে। এলাকার মানুষ প্রতিষ্ঠা করেছেন : 'রঘু ডাকাত কালী মন্দির রক্ষা সেবা সমিতি'। সরকারি স্বীকৃতিও জুটেছে এই সমিতির ভাগ্যে (রেজি নং - এস/১এল/৫৩২৫৭)।

ক্ষেত্র-সমীক্ষায় ডাকাতের হদিশ পাওয়ার মোক্ষম উপায় কালীমন্দির বা কালীতলাগুলি চিহ্নিত করা। কারণ ডাকাতির আগে ডাকাতের কালীপুজো ও নরবলি দেওয়ার কিংবদন্তী অনেকটা সূর্যের পূর্ব দিগন্তে উদয় ও পশ্চিমে অস্ত যাওয়ার মতোই শাশ্বত। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বক্তব্য : 'রঘু ডাকাতের উপদ্রব বিশেষ করিয়া নৈহাটি থানা ও বারাসতের কদমগাছি থানা এবং হুগলি, চব্বিশ পরগণা পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল।' ('বাংলার ডাকাত', অখণ্ড শৈবা সং. ২০১১। পৃ: ৬৪)। ক্ষেত্র-সমীক্ষায় এইসব চত্বরে রঘু ডাকাতের কিংবদন্তী বিজড়িত বেশ কিছু ডাকাতে-কালীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নৈহাটির নিকটবর্তী কাঁচরাপাড়ার বীজপুর থানা মোড়। সেখানেই রয়েছে এক ডাকাতে-কালীমন্দির। যার খ্যাতি শুধু কাঁচরাপাড়া নয়, গোটা চব্বিশ পরগণা, মায় হুগলি, নদীয়া ও কলকাতা জুড়েও। এখানে প্রচলিত কিংবদন্তী— একদা এই স্থানে ছিল সুপ্রাচীন এক নিমগাছ। সিঁদুর, চন্দন পরিয়ে এই বৃক্ষটিকেই কালীজ্ঞানে (অন্যমতে এই গাছের তলায় কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে) জবার মালা চড়িয়ে স্বয়ং রঘু ডাকাত (অন্যমতে তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা)-ই নাকি এখানে পুজো করতেন। বর্তমানে সেই নিমগাছও নেই (অবশ্য তার গুঁড়িটুকু রয়েছে), সেই রঘু ডাকাতও নেই। তবে রঘুর কিংবদন্তী রক্ষায় মন্দিরের অবাঙালি পূজারিরা যথেষ্ট সচেষ্ট।

বারাসতের বুনোকালীতলায় নদীভাগ এলাকার কাঠোর রোডে অশ্বত্থ গাছের তলায় ভাঙাচোরা, জরাজীর্ণ একটি কালীমন্দিরও রঘু ডাকাতের কিংবদন্তী-সমৃদ্ধ। নামে কালীমন্দির অথচ মন্দিরে কালীমূর্তি নেই। ক্ষেত্র-সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, এলাকার মানুষের বিশ্বাস, মন্দিরে যাঁরাই (এঁদের মধ্যে অনেক তান্ত্রিকও আছেন) কালীমূর্তি বসিয়ে পুজোর চেষ্টা করেছেন কিংবা মন্দির সংস্কার করতে গিয়েছেন ঘোর বিপদে পড়েছেন তাঁরাই। মন্দিরটি সম্ভবত বাদুর ঘোষালবাড়ির বিনোদবিহারী ঘোষালের প্রতিষ্ঠিত। যাই হোক, রঘু ডাকাতের পুজোর জায়গায় কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা? ওরে ব্যাটা, রঘু শাপ দেবে না! যতই সে ধরাধামে না থাকুক, ওমন ডাকাতের আত্মার সঙ্গেও এঁটে ওঠা কি চাট্টিখানি কথা? সুতরাং যেমন ছিল, তেমন আছে। তেমনই থাকবে। আরও কয়েকটি রঘু ডাকাতের কালীর সন্ধান মিলেছে। যেমন হুগলি সীমান্তে বালিখালে। একসময় গঙ্গা প্রবাহিত ছিল বর্তমান এই মন্দিরের পার্শ্ববর্তী স্থানেই। প্রচলিত কিংবদন্তী— একদিন গঙ্গা দিয়ে নৌকো করে ডাকাতিতে যাওয়ার সময় জঙ্গলে ঢাকা নির্জন এই জায়গায় একটি ভাঙা দেউলের গায়ে ডানহাতের তিনটি আঙুল তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার ছাপ দেখতে পান রঘু। বিস্মিত হয়ে তিনি ঘাটে নৌকো ভিড়িয়ে দেখেন সুপ্রাচীন এক শিলাখণ্ডে পড়ে রয়েছে মাটির অঙ্গুলিত্রয়। বিষয়টিকে তাঁর আরাধ্যা কালী

ঠাকুরের আশীর্বাদ মনে করে ওই ভগ্ন দেউল সংস্কার করিয়ে আট ন'ফুটের ভীষণদর্শনা, মুণ্ডমালা বিভূষিতা, লোলজিহ্বা, রক্তম্বরা এক কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। নিজের বৃদ্ধা মা-কেও নাকি এখানে এনে রেখেছিলেন রঘু। বর্তমানে মন্দিরটি সংস্কারিত, সেই কালীমূর্তিটিও আর নেই। মাখলা গ্রামের রতন ডাকাত (রতন পাখি)-র কিংবদন্তীও অবশ্য এর সঙ্গে জড়িত।

পানিহাটিতে মহোৎসবতলা ঘাটে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির।

সহজবোধ্য কারণেই রঘুর পক্ষে স্থায়ী মন্দির নির্মাণ করা অনেক ক্ষেত্রেই অসাধ্য ছিল। পুলিশের তাড়া খেয়ে সর্বদা যাকে চম্পটউবাচ হতে হতো, তিনি নিজের স্থায়ী ডেরা করে স্বেচ্ছায় বৃটিশ ফৌজের নজরবন্দি হবেন— এতটা আশা করা বাতুলতা। অবশ্য সেকালে কলকাতা, দুই চব্বিশ পরগণা কিংবা হাওড়া, হুগলিতে এমন বন-জল-জঙ্গলাকীর্ণ স্থানও ছিল, যেখানে পৌঁছোয় এমন সাধ্য ব্রিটিশ পুলিশের ছিল না। সেখানে এককালে রঘু নির্মিত মন্দির ইত্যাদি কিছু থাকতেই পারে। পরে কালের নিয়মেই তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। পানিহাটির মহোৎসবতলা ঘাটের মুখার্জি বাড়ির কালী মূর্তিটিও নাকি রঘু ডাকাতের পূজিত। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে গঙ্গা দিয়ে এই অঞ্চল থেকে একটি খাল বেরিয়ে সোদপুর, ঘোলা, নাটাগড় হয়ে বারাসত, বসিরহাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রবল জনশ্রুতি, ছোটো জলযান বাইচে চেপে এই জলপথেই ডাকাতিতে যেত প্রবল প্রতাপান্বিত রঘু ডাকাত। এলাকায় মজাপুকুরের স্মৃতি নিঃসন্দেহে অতীত-গন্ধবাহী। ডাকাতিতে যাওয়ার আগে রঘু গাছতলাতেই সেরে নিত মুখুজ্যে বাড়ির বর্তমান কালীমূর্তিটির পুজো। পরে পরাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গৃহ নির্মাণ করে এই মূর্তিটিকে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। যার পোশাকি নাম সিদ্ধেশ্বরী। কথিত আছে, রঘুর আরাধ্যা কালীদেবীর নামও ছিল সিদ্ধেশ্বরী।

এতক্ষণ রঘুর কালী উপাসনার ব্যাপারে যা যা উপরে বর্ণিত হলো, তাকে কিংবদন্তী বলতে পারেন, 'মিথ' বলতে পারেন কিংবা 'জনশ্রুতি'ও বলা যেতে পারে। 'রূপকথা' বললেও দোষের কিছু নেই। কিন্তু আর যাই হোক, 'ইতিহাস' বলা চলে না। 'বাংলার ডাকাত' গ্রন্থে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রঘু ডাকাতের কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতাকে পাত্রপক্ষের জুলুমের হাত থেকে বাঁচানোর যে কাহিনি শুনিয়েছেন, কিংবা নৈহাটি থানার দারোগা দুর্গাচরণ চক্রবর্তী বা নৈহাটির জনৈক বিনোদবাবুকে রঘু ডাকাতের রীতিমতো ঘোল খাওয়ানোর যে বর্ণনা দিয়েছেন, মহারানি সুনীতিদেবীর গল্পেও কলকাতার সম্ভ্রান্ত জমিদার মাধববাবুর চন্দননগরের বাড়িতে ডাকাতির ক্ষেত্রে রঘুর যে মুন্সিয়ানার পরিচয় রয়েছে তার মধ্যে ইতিহাস খোঁজার চেষ্টা নিরর্থক। কিন্তু এও তো অবশ্য স্বীকার্য যে কিংবদন্তীকে ইতিহাসের ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিতে পারলেই ঐতিহাসিক উপাদানের সন্ধান মেলে।

রঘুই বা তার ব্যতিক্রম হবেন কেন? রঘুর চেয়ে বিশে ডাকাত, চিতে ডাকাত কিংবা মনোহর ডাকাত কম দুর্ধর্ষ ছিলেন না। কিন্তু এদের আঞ্চলিকতা ছিল। ডুমুরদহের বিশে ডাকাত যশোহর-কৃষ্ণনগর, চিতে ডাকাত উত্তর কলকাতার চিৎপুর আর মনোহর ডাকাত দক্ষিণ কলকাতার মনোহর পুকুরের বাইরে বেরোতে পারেননি। সরকারি নথি কিংবা সাময়িক সংবাদপত্রেও এদের সন্ধান দুষ্প্রাপ্য নয়। সেদিক দিয়ে রঘু ডাকাত এক কুহেলিকা মাত্র। তার বাড়ি কোথায় কেউ জানে না, কোথায় ডাকাতি করবে কেউ জানে না, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রঘুর ডাকাতি-এলাকার যে ম্যাপরুট দিয়েছেন (বিশেষ করে নৈহাটি থানা ও বারাসতের কদমগাছি থানা এবং হুগলি, চব্বিশ পরগণা পর্যন্ত) তার বাইরেও যে তিনি পদার্পণ করেননি সে নিশ্চয়তা কোথায়? আসলে রঘু ছিলেন অপ্রতিরোধ্য, তার কুহেলিকার মায়াজাল ব্রিটিশ শাসকের স্পর্ধোদ্ধত অর্থ-কৌলীন্যও ভেদ করতে পারেননি। তাই রঘু ডাকাত ছিলেন ইতিহাসে, আছেন কিংবদন্তীতে এবং থাকবেন রূপকথায়।

दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर मंगलमय शुभ कामनाये
विश्व स्तर के पी. टी. एफ. ई. इन्सुलेटेड वायर,
केबल व नलिका, के निर्माता।

इस पुनीत राष्ट्रीय पर्व पर संकल्प लें कि हम भारत राष्ट्र
को सशक्त, संगठित और सक्षम बनाने में सहयोग करें।

गर्ग एसोसिएट्स
प्राइवेट लिमिटेड

M/s. Garg Associates Private Limited

Regd. Office : D-6, Meerut Road Industrial Area - 3
Ghaziabad - 201 003 (U.P.) INDIA

e-mail : sales@gargasso.com

Phone : 0120-2712128/2712039
Fax : 91-120-2712051